ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী

الاجتهاد والتقليد

ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد

ইজতিহাদ ও তাক্বলীদের দলীল সমূহের ক্ষেত্রে উপকারী কথা

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني

মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আশ-শাওকানী আল-ইয়ামানী

অনুবাদ: হাবিবুল্লাহ বিন আইয়ূব
দাওরা হাদীস (মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা)
অনার্স, মাস্টার্স (বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা),
কামিল (মাদরাসা-ই-আরিয়া, ঢাকা)।

সম্পাদনা: আব্দুল্লাহ আল মামুন
এম. ফিল (গবেষক) আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر :مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ
www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ -ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২১ ঈসায়ী।

নির্ধারিত মূল্য: ১২০ (একশত বিশ) টাকা।

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তার কোন শরীকও নেই। আর আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাস এবং তার প্রেরিত রসূল। অতঃপর বলছি, নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে সেরা নীতি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রীতি-নীতি। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ নতুন আবিষ্কৃত পথ ও মত।

আলোচ্য বইটি মূলত ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ নিয়ে লেখা। বইটির পূরো নাম **القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد** ইজতিহাদ ও তাক্বলীদের দলীল সমূহের ক্ষেত্রে উপকারী কথা। অনেকদিনের ইচ্ছা ইমাম শাওকানীর বই প্রকাশ করবো, আর এ ব্যাপারে আবূ হাযম ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে আরো উৎসাহিত হলাম। প্রথমে আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী ভাইকে অনুবাদ করার অনুরোধ করি। তিনি সময়ের অভাবে অগ্রসর হতে পারেননি। পরে অনুবাদের কাজটা হাবিবুল্লাহ বিন আইয়ূব ভাইকে দেয়ায় তিনি তা সম্পন্ন করেন। মূলত অনুবাদ জটিল ও কঠিন ছিল। সম্পাদনা করার জন্য মাকতাবাতুস সুন্নাহর সহকারী গবেষক আব্দুল্লাহ আল মামুন ভাইকে দেয়া হয়। যথেষ্ট শ্রম ও সময় নিয়ে তিনি সম্পাদনার জটিল কাজটি সম্পন্ন করেন। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম যাযা প্রদান করুন।

সকলের দু‘আ চাই যেন আমরা মুসলিম উম্মাহর গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণীয় আলেমদের বই প্রকাশ করতে পারি। হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করো।

প্রকাশক:
ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ
পরিচালক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ। মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

ইমাম আশ-শাওকানীর জীবনী

বংশ ও জন্মস্থান

শাওকানী নিজেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: “মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আশ শাওকানী, ছ্বান’আনী”।

الشوكاني: শব্দটি দ্বারা মূলত ‘হিজরাতু শাওকান’ নামক গ্রাম উদ্দেশ্য, যা খাওলান গোত্রের কোনো এক শাখা গোত্রের নিবাস ‘হামীয়াহ’ এর অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহের একটি গ্রাম, যেই গ্রামের মাঝে আর ছ্বান’আ শহরের মাঝে একদিনের দূরত্ব। আর ছ্বান’আনী শব্দটি দ্বারা ছ্বান’আ শহরের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, যেখানে তার (লেখক) পিতা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল, ‘হিজরাহ’ (হিজরাতু শাওকান) অঞ্চলে জন্ম নেওয়ার পরে সেখানেই (ছ্বান’আ) তিনি বড় হয়েছেন।

তার জন্ম ও লালনপালন

শাওকানী তার আত্মজীবনী রচনায় নিজের জন্মতারীখ এর বর্ণনায় স্বীয় পিতার লিপি থেকে উদ্ধৃত করে বলেন: তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন — তার পিতার লিপিতে যেভাবে পেয়েছেন সেই অনুসারে — সোমবার দিবসের মধ্য-প্রহরে, যূল ক্বা’দাহ এর ২৮ তারীখে ১১৭৩ হিজরীতে। তার পিতা এবং তার নিজের পক্ষ থেকে এই উক্তির পরে তার জন্মতারীখ নিয়ে মতানৈক্যের কোনো সুযোগ নেই।

ক্বুরআন হিফয করেছেন এবং ক্বুরআনের তাজবীদ আত্মস্থ করেছেন, শিক্ষা জীবনে প্রবেশের পূর্বেই, আর অনেক বড় বড় মতনসমূহ (কোনো শাস্ত্রের মৌলিক কিতাবসমূহ) মুখস্থ করেছেন যখন তার বয়স দশের কোঠায়

পৌঁছেনি। এরপরে তিনি বড়বড় শায়েখদের সঙ্গে মিলিত হন, তিনি ইতিহাস অধ্যায়ন ও সাহিত্যের মাজলিসসমূহে অত্যাধিক ব্যস্ত থাকতেন।

আর যখন আমরা জানতে পারলাম, তিনি বিশ বছর বয়সে ইফতা (ফতওয়া প্রদান করা) এর নেতৃত্বের আসন লাভ করেছেন, তখন বুঝতে পারলাম, এই ছাত্রের ছাত্রজীবন কেমন ছিল, যাকে তার পিতা কখনোই ইলম ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে ব্যস্ত হওয়ার সুযোগ দেননি, যেমনিভাবে তাকে কখনোই তার বাবা ছ্বান'আ থেকে বের হওয়ার সুযোগ দেননি।

দৈনিক দিনে ও রাতে তার দারসের সংখ্যা ছিল প্রায় তেরটি: যেগুলোর কিছু ছিল এমন: যা তিনি তার শায়েখদের থেকে গ্রহণ করতেন। কিছু দারস ছিল এমন: যা তার ছাত্রগণ তার কাছ থেকে গ্রহণ করত, এভাবেই এক মেয়াদকাল পর্যন্ত চলতে থাকে।

শাওকানী বিভিন্ন শাস্ত্র যেমন, ফিক্বহ ও উছূলুল ফিক্বহ, হাদীছ, লুগাহ, তাফসীর, সাহিত্য ও মানত্বেক্ব ইত্যাদি শাস্ত্রের অনেকগুলো এমন কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো তিনি বিখ্যাত আলেমদের সম্মুখে সংশোধন ও তাহক্বীক্বের উদ্দেশ্যে পাঠ করেছেন।

শিক্ষা জীবন

(ইলম অর্জনের পথে) তার প্রখর মেধা ও সঞ্চারণশীল সভ্যতা তাকে সহযোগিতা করেছে হাদীছ ও উ'লূমুল হাদীছ, ফিক্বহ ও উছূলুল ফিক্বহ সহজেই আত্মস্থ করে ত্রিশ বছরের পুর্বেই তাক্বলীদ এর শিকল থেকে মুক্তিলাভ করা ও ইজতিহাদের দিকে মনোনিবেশ করতে।

এরপূর্বে তিনি ছিলেন যায়দীয়্যাহ মতবাদের অনুসারী, পরবর্তীতে তিনি মহা মনীষীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তাক্বলীদ পরিত্যাগ করে কিতাব-সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদ এর ভিত্তিতে নিঃসৃত বিধিসমূহকে আঁকড়ে ধরার আন্দোলনের মহানায়ক ছিলেন। আর এই কারণেই তিনি আধুনিক যুগের প্রথম সারির মুজাদ্দিদগণের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছেন। আর ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যারা আধুনিক যুগে মুসলিম উম্মাহকে জাগ্রত করার মহা সংগ্রামে নাম লিখিয়েছেন।

তিনি প্রাণহীনতার চাপ ও তাক্বলীদের অন্যায়কে ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন, যা চতুর্থ হিজরী পরবর্তী মুসলিম উম্মাহর (ঈমানের) উপর মরিচা ধরিয়ে দিয়েছিলো এবং 'আক্বীদাহকে ওলটপালট করার ক্ষেত্রে, বিদ'আহ এর বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে, বানোয়াট ও কুসংস্কারমূলক ধ্যানধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এবং দীনি শিক্ষা থেকে মানুষের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও ধ্বংসাত্মক ও পাপাচারমূলক বিষয়াবলীর প্রতি নিবেদিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যে বিষয়গুলো তাকে তাক্বলীদ ও স্থবিরতার বিরুদ্ধে ক্বলম ধরতে ও মুখে বলতে বাধ্য করেছিল, আর তার জীবন স্থির হয়ে গিয়েছিল এ জাতীয় ভ্রান্ত বানোয়াট মতবাদগুলোর সংস্কার এবং এ জাতীয় বাত্বিল আক্বীদাগুলো সংশোধনের চেষ্টায়। আমারা যথাসম্ভব এই ইলমী জীবনের দূরত্বের মাত্রাসমূহকে তিনটি লক্ষবস্তুতে বিভক্ত করে বর্ণনা করার চেষ্টা করব:

১. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ পরিত্যাগের আহবান।

২. রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের যুগে বিদ্যমান সালাফদের অকৃত্রিম আক্বীদাহ এর পথে আহবান।

৩. ইসলামী আক্বীদাহ এর সাথে সাংঘর্ষিক প্রতিটি বিষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আহবান।

আর এই সকল আহবানের মূলে রয়েছে- জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের উপযুক্ত বাস্তবায়ন।

বিচার বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ

মুস্বত্বফা ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরীর ১২০৯ তম বর্ষে ইয়েমেনের প্রধান ক্বাযী ইয়াহয়া ইবনে ছলিহ আশ-শাজারী আস-সুহূলী মৃত্যুবরণ করেন, তিনি ছিলেন সাধারণ ও বিশেষ সর্বস্তরের মানুষের কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই ছিলেন সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও বিধিবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যক্তি, তিনিই ছিলেন বাদশাহ ও মন্ত্রণালয়ের পরামর্শদাতা।

শাওকানী বলেন: আমি সেই সময়ে ইজতিহাদ ও ইফতা বিষয়ক শাস্ত্রগুলোর দারস প্রদান ও লেখনীর কাজে ব্যস্ত ছিলাম, মানুষের থেকে দূরে থাকতাম। বিশেষতঃ শাসকবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ থেকে, কেননা, আমি তাদের কারো সাথে কোনোভাবেই মিলিত হতাম না, আর ইলম ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আমার কোনো প্রকার আগ্রহ ছিল না।

এরপরে উক্ত ক্বাযীর মৃত্যুর পরে প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমি তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আমার ছাত্রদের ব্যতীত আর কারোর কথা কল্পনা করিনি।

অতঃপর আমি মহামান্য প্রধান বিচারকের এই পদের বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য যখন গেলাম, আমাকে জানানো হল যে, উক্ত বিচারকের পদে আমার নিয়োগ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তখন আমি আমার ইলমের সাথে ব্যস্ত থাকার কথা জানালাম, তখন তিনি (প্রধান শাসক, যাকে তৎকালে খলীফা বলা হতো) বললেন: উভয় কাজই আপনি একত্রে সমাধান করতে পারবেন।

আর বিচারকমণ্ডলী যেই দুই দিবসে শাসকের দরবারে একত্রিত হন, সেই দুই দিবসে দরবারে আসা বিবাদসমূহের মীমাংসা করা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়নি। তাই আমি বললাম: আমি আল্লাহর নিকট ইস্তিখারাহ করবো এবং গুণীজনের নিকট থেকে পরামর্শ নিবো, আর আল্লাহ তা'আলা যা নির্বাচন করেন, তাতে নিঃসন্দেহে কল্যাণ নিহিত আছে,

এরপরে যখন আমি তার কাছ থেকে চলে আসলাম, এক সপ্তাহ পর্যন্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম, কিন্তু আমার নিকট আগত ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন এমন, যারা ছান'আ শহরের মানুষের নিকট আলেম বলে পরিচিত, তারা সকলেই একমত হয়ে বললেন, আপনার জন্য হ্যাঁ করে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ, তারা এই বড় পদ - যা ইয়েমেনের সর্বস্তরের মানুষের শারঈ বিধিবিধানের কেন্দ্রবিন্দু - এই ইলম ও দীনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নয় এমন ব্যক্তির অনুপ্রবেশের ভয় পাচ্ছিলেন।

যে কারণে আমি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তারই উপর ভরসা করে এই মহান দায়িত্ব কবূল করে নিলাম। আর আমি আল্লাহর নিকট এই মর্মে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেনো তার কৌশল ও সামর্থ দ্বারা আমাকে তার সন্তুষ্টির পথের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। আমার মাঝে আর আমার সমূহ অপরাধের মাঝে যেন দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন। আমার জন্য যেন তিনি কল্যাণ অর্জন সহজ করে দেন, চাই তা যেখানেই থাকুক না কেনো। আমার থেকে যেনো তিনি সকল অকল্যাণ দূর করে দেন। আর আমাকে যেনো তিনি ন্যায়ের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। আর আমার জন্য যেনো তিনি দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত এমন কাজ নির্বাচন করে দেন।

এছাড়াও আল্লামা শাওকানী বিচারকার্যে নিয়োজিত হওয়ার মাঝে সুন্নাহ এর প্রচার, বিদ'আহ এর মূলোৎপাটন এবং সালাফদের পথে আহবান করার বড় সুযোগ দেখেছিলেন। যেমনিভাবে তিনি দেখেছিলেন বিচারকের এই গুরু পদ তাকে লক্ষ্য করে ধেয়ে আসা অনেক ঝড়-ঝাপটা থেকে অচিরেই তাকে সহযোগিতা করবে এবং তার অনুসারীদের জন্য তার সরল মতাদর্শগুলোকে ও তার সঠিক মত ও পথকে প্রচার করার কাজকে সহজ করে দিবে।

ঐ তিনজন শাসক, যাদের আমলে আল্লামা শাওকানী গুরু বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত তাকে কখনো বরখাস্ত করা হয়নি, তারা হলেনঃ

১. আল মানছুর আলী ইবনুল মাহদী আব্বাস, যিনি ১১৫১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১২২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার খিলাফত ২৫ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

২. তারই (প্রাক্তন খলীফা) সন্তান আল মুতাওাক্কিল আলী ইবনে আহমা বিন আল মানছুর আলী, যিনি ১১৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১২৩১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার খিলাফত প্রায় ৭ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

৩. আল মাহদী আব্দুল্লাহ, যিনি ১২০৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১২৫১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার খিলাফত ২০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

শাওকানীর বিচারকের পদ গ্রহণ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অনেক বড় অর্জন ছিল। কারণ, তিনি সুস্পষ্টরূপে ন্যায়ের বাজারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যালেমের থেকে নিয়ে মাযলুমকে তার যথাযথ হক্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, ঘুষ (সমাজ থেকে) বিদূরীত করেছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে হালকা করে দিয়েছেন এবং মানুষকে ক্বুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আহবান করেছেন। তবে এই দায়ভার তাকে তার ইলমী তাহক্বীক্ব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যা স্পষ্টতই বোঝা যাবে, যখন কোনো ব্যক্তি তার বিচারকের দায়ভার গ্রহণের পূর্বের ও পরের গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করবে, তখন সে স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাবে।

তার লিখিত গ্রন্থসমূহ

১. আদ্দারারিল মুদ্বীয়্যাহ শারহুদ্দুরারিল বাহীয়্যাহ ফিল মাসায়িলিল ফিক্বহীয়্যাহ (الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية)

২. ওয়াবলুল গমাম আলা শিফা'য়িল উওয়াম (وبل الغمام على شفاء الأوام)

৩. আদাবুত ত্বলাব ওয়া মুন্তাহাল আরাব (أدب الطلب، ومنتهى الأرب)

৪. আস-সায়লুল জাররার আল-মুতাদাফফিক্ব আলা হাদা'য়িক্বিল আযহার (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)

৫. আল ফাওয়া'ইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওদ্বূ'আহ (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة)

৬. দাররুস সাহাবাহ ফী মানাক্বিবিল ক্বারাবাতি ওয়াছ্ব ছ্বাহাবাহ (در السحابة في مناقب القرابة والصحابة)

৭. আল বাদরুত্ব ত্বালি’ বি মাহাসিনা মিম বা’দিল ক্বরনিস সাবি’ (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع)

৮. ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহক্বীক্বিল হাক্কি মিন ইলমিল উছূল (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول)

৯. তুহফাতুয যাকিরীন বি’ইদ্দাতিল হিছ্বনিল হাছ্বীন মিন কালামি সায়্যিদিল মুরসালিন (تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين)

১০. ক্বত্বরুল ওয়ালী আলা হাদীসিল ওয়ালী, অথবা বিলায়াতুল্লহি ওয়াত্ব ত্বরিক্বু ইলাইহা, (قطر الولي على حديث الولي، أو ولاية الله والطريق إليها)

১১. নায়লুল আওত্বার মিন আসরারি মুন্তাক্বাল আখবার (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار)

১২. ফাতহুল ক্বাদীর আল জামে’ বায়না ফান্নাইর রিওয়ায়াহ ওয়াদ্দিরায়াহ মিন ইলমিত তাফসীর (تح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)

১৩. আল ফাতহুর রাব্বানী মিন ফাতাওয়া আশ-শাওকানী (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني)

১৪. আল-ক্বওলুল মুফীদ ফি আদিল্লাতিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ (القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد)

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তার প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার কাছে আমরা ইস্তিগফার করি। আর আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আমাদের আত্মার অনিষ্ট থেকে, আমাদের আমলের খারাপি থেকে। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সেই হিদায়াত প্রাপ্ত হয়, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একক তার কোনো শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রসূল।

অতঃপর, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী, আর সর্বোত্তম পথ নির্দেশনা হলো মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পথ নির্দেশনা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো তাতে নতুন সংযোজিত বিষয়। আর প্রত্যেক নতুন সংযোজিত বিষয় হলো বিদ‘আত, আর প্রত্যেক বিদ‘আত হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিয়ে যাবে। [ছ্বহীহঃ সুনানে নাসাঈ হা/১৫৭৮]

অতঃপর, মুজাহিদ মুজতাহিদ বিজ্ঞ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ কোন একজন মুহাক্বীক্ব আলিম আমার কাছে দাবি করেছেন, আমি তার জন্য যেন এমন একটি প্রবন্ধ সংকলন করি যাতে তাক্বলীদ কি জায়িয নাকি জায়িয নয় এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য একত্রিত হয়। এরপরে যেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ না থাকে, আর এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন যেন গ্রহণযোগ্য না হয়।

এই প্রশ্নকারী যখন একজন প্রথিতযসা ‘আলিম, সুতরাং তার জবাব ছিল বিতর্ক বিদ্যার (علم المناظرة) পদ্ধতি অনুসরণে। সুতরাং আল্লাহর উপর ভরসা করে (তাক্বলীদকে যারা জায়িয বলেন তাদের দলীলসমূহ) আমরা পর্যালোচনা করবো।

أَدِلَّة الْقَائِلِين بِجَوَاز التَّقْلِيد

তাক্বলীদকে যারা জায়িয বলেন, তাদের দলীলসমূহ

যেহেতু তাক্বলীদকে নাজায়িয বলার প্রবক্তা এটাকে নিষেধ করার অবস্থানে রয়েছেন, আর তাক্বলীদকে জায়িয বলার প্রবক্তা অভিযোগকারী হিসেবে দাবি করছেন যে তা জায়িয, সুতরাং জায়িয দাবিকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই (মতের স্বপক্ষে) দলীল পেশ করতে হবে। (আর এ কারণে) যারা জায়িয বলার পক্ষে তারা কয়েকটি দলীল পেশ করে থাকেন।

প্রথম: মহান আল্লাহর বাণী:

﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾

"তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।" [সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৭]

তারা বলে, মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, যার জ্ঞান নেই সে যেন তার চেয়ে বেশি জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়।

উত্তর: এ পবিত্র আয়াতটি নির্দিষ্ট একটি প্রশ্নের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। যা এ বিতর্কের বিষয়বস্তুর বাইরে, যেমনটি তারা যা দ্বারা দলীল পেশ করেছে, তার আগের ও পরে উল্লেখিত বর্ণনা প্রসঙ্গ থেকে জানা যায়। ইবনু জারীর ও বাগাভীসহ অধিকাংশ তাফসিরকারকগণের মতে, আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ঐ সকল মুশরিকদের দাবির খণ্ডনে, যারা রসূলের মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করতো। 'আদ-দুররুল মানছূর' কিতাবে ইমাম সুয়ূত্বী রহিমাহুল্লাহ এটা পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর এটাই সেই অর্থ যা বর্ণনা প্রসঙ্গ হতে জানা যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾

“আর আমরা আপনার পূর্বে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম (নাবী হিসাবে), আমরা তাদের প্রতি অহী করেছিলাম। সুতরাং তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।”[সূরা আন নাহল ১৬:৪৩, আল আম্বিয়া ২১:৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنۡ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ رَجُلٖ مِّنۡهُمۡ ﴾

“মানুষের কাছে কি আশ্চর্য লাগছে যে, আমি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্য থেকে একজন লোকের নিকটে।” [সূরা ইউনুছ ১০:২]

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِم مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰٓۗ ﴾

“আপনার পূর্বে আমি জনপদবাসীদের মধ্য থেকে যতজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল যাদের প্রতি আমি অহী নাযিল করতাম।” [সূরা ইউসুফ ১২:১০৯]

অনুমানের ভিত্তিতে ধরা হয় যে, এখানে জিজ্ঞেস করার ব্যাপারটি ব্যাপক, আর যাদেরকে জিজ্ঞেস করার কথা বলা হয়েছে তারা হলো আহলুয্ যিকর (أهل الذّكر)। আর যিকর হলো আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত। এ দু’টি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আর আমি মনে করি না যে, কোনো ভিন্ন মতপোষণকারী এ ব্যাপারে মতভেদ করবেন। কারণ, এ পবিত্র শরী’আত হয়ত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তা হলো আল-কুরআনুলকারীম অথবা রসূল ছল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আর তা হলো সুন্নাত। আর এর কোনো তৃতীয় (উৎস) নেই।

আর যখন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দেওয়া হলো যারা কুরআন-সুন্নাহ এর জ্ঞানী। এখান থেকে বোঝা গেল যে, উল্লেখিত আয়াতটি মুকাল্লিদদের বিরুদ্ধে দলীল, তাদের পক্ষে দলীল নয়। কারণ, তারা কুরআন-সুন্নাতের আলেমদের কাছে উত্তরের জন্য জিজ্ঞেস করে, আর তাদের থেকে উত্তর আসে এভাবে যে তারা বলেন, আল্লাহ এরকম বলেছেন, আর সে অনুযায়ী প্রশ্নকারীরা আমল করে। আর এটা এমন বিষয় যা এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশকারী মুক্বাল্লিদ ব্যক্তির চাওয়ার বিপরীত। সে তো দলীল পেশ করতে চেয়েছে যে মতের ওপর সে আছে তার জায়িয হওয়ার স্বপক্ষে, আর তা হলো কোনো দলীল জিজ্ঞেস না করেই ব্যক্তিদের কথাকে আঁকড়ে থাকা। আর এটাই হলো তাক্বলীদ (التَّقْلِيد)। একারণেই আলিমগণ প্রচলন করেছেন যে, তাক্বলীদ হলো দলীল জিজ্ঞেস না করেই অন্যের কথাকে গ্রহণ করা।

তাক্বলীদের মূলকথা হলো, মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে না। বরং সে শুধুমাত্র জিজ্ঞেস করবে তার ইমামের মাযহাবের কথা। যখনই সে তা অতিক্রম করে কুরআন ও সুন্নাহর (দলীলের) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে, তখন সে আর মুকাল্লিদ থাকবে না। আর এ কথা সকল মুক্বাল্লিদই মেনে নেয়, কেউই অস্বীকার করে না। যখন এটা নির্ধারিত হয়ে যায় যে, কোনো মুক্বাল্লিদ কোনো আহলে যিকরকে আল্লাহর কিতাব ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তবে সে আর মুক্বাল্লিদ থাকে না, তখন তুমি জানতে পারলে যে, এই আয়াতটি এটা মেনে নেওয়াকে আবশ্যক করে যে, উক্ত প্রশ্ন প্রসঙ্গ যে দিকে ইঙ্গিত করে শুধুমাত্র এমন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়/ ব্যাপারে নয়। বরং তা শরী’আতের প্রতিটি বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট, যেমনটি মুক্বাল্লিদ ধারণা করে। (সুতরাং) এই আয়াত মুক্বাল্লিদের দাবিকে তারই মুখে নিক্ষেপ করবে, আর তার নাককে ধূলিমলিন করবে এবং তার পিঠ ভেঙ্গে দিবে যেমনটি আমরা সাব্যস্ত করেছি।

দ্বিতীয়ঃ তারা যা দ্বারা দলীল পেশ করে তার সারাংশ হলো, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় ক্ষত ব্যক্তির হাদীছে বলেন, তারা যখন বিষয়টি জানতো না, তখন কেন জিজ্ঞাসা করল না, না জানার চিকিৎসা তো কেবল জিজ্ঞাসা করা।[১]

অনুরূপ ভাড়াটে শ্রমিকের হাদীছটি,[২] যে তার বাড়ির মালিকের স্ত্রীর সাথে যিনায় লিপ্ত হয়েছিল। শ্রমিকটির পিতা বলল, আমি জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা সকলে আমাকে সংবাদ দিল যে, আমার ছেলেকে একশত বেত মারতে হবে, আর এ ব্যক্তির স্ত্রীকে রজম বা পাথরের আঘাতে হত্যা

---

[১] রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি আহত হয়। ঐ অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দেয়া হয়। অতঃপর সে গোসল করলে তার মৃত্যু হয়। এ সংবাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছালে তিনি বলেনঃ এরা লোকটিকে হত্যা করেছে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন! অজ্ঞতার প্রতিষেধক জিজ্ঞাসা করা নয় কি? হাসানঃ সুনানে আবূ দাউদ হা/৩৩৭।

[২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৯৩। আবূ হুরাইরাহ ও যায়দ ইবনু খালিদ জুহানী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, এক বেদুঈন এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়ছালা করুন। তখন তার বিবাদী পক্ষ দাঁড়াল এবং বলল, সে ঠিকই বলছে। আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়ছালা করুন। তারপর বেদুঈন বলল যে, আমার ছেলে এ লোকের মজুর হিসেবে কাজ করত। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করেছে। লোকেরা আমাকে বলল, তোমার ছেলেকে রজম করা হবে। আমি একশ’ বকরী ও একটি দাসী দিয়ে আমার ছেলেকে তার থেকে মুক্ত করেছি। পরে আমি এ বিষয়ে আলেমদের জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, তোমার পুত্রকে একশ’ বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিস্কারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাব মোতাবেক তোমাদের মাঝে ফায়ছালা করব। দাসী ও বকরীগুলো তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর তোমার ছেলেকে একশ’ বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিস্কারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। হে উনায়স! তুমি কাল এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাও অতঃপর তাকে রজম কর। অতঃপর উনায়স পর দিন সেই স্ত্রী লোকের কাছে গিয়ে তাকে রজম করল।

করতে হবে। আর ঘটনাটি সাব্যস্ত যা 'ছ্বহীহ' গ্রন্থে (ছ্বহীহুল বুখারীতে) রয়েছে। তারা বলে, যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি জানে সে ব্যক্তির তাক্বলীদকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকচ করেননি।

উত্তর হলো: মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মানুষের মতামত জানার প্রতি দিক-নির্দেশনা প্রদান করেননি, বরং তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন শরী'আতের সেই সকল বিধানের প্রতি যা আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। এ কারণেই তিনি জ্ঞান ছাড়া ফাতাওয়া প্রদান করার জন্য তাদেরকে বদ দু'আ দিয়েছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ

তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন।[৩]

এছাড়াও তারা যখন তাদের রায় অনুযায়ী ফাতাওয়া প্রদান করল তখন হাদীছটি তাদের বিরুদ্ধে দলীল হলো, তাদের পক্ষে নয়। কেননা তাতে দু'টি বিষয় শামিল রয়েছে, একটি হলো, দলীল দ্বারা সাব্যস্ত বিধান জানতে চাওয়ার নির্দেশনা, আর দ্বিতীয়টি হলো, তাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন, তাদের মতামতের ওপর নির্ভর করা, আর সে অনুযায়ী ফাতাওয়া প্রদান করার কারণে, আর এ বিষয়টি সকল আলিমেরই জানা।

কেননা জিজ্ঞাসার দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর তিনি তো তাদের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছেন। সুতরাং জিজ্ঞাসার দিক-নির্দেশনা তার থেকেই নিতে হবে। আর যদি বিষয়টি মুত্বলাক্ব বা স্বাভাবিক হয়, তবে উদ্দেশ্য হয় স্বয়ং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা অথবা যে তার থেকে (রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছে তাকে

---

[৩] সুনানে আবূ দাউদ হা/৩৩৭, সনদ হাসান।

জিজ্ঞেস করা। আর ইতোপূর্বে আপনি যেমনটি জানতে পেরেছেন যে, মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি তখনই মুক্বাল্লিদ হবে যখন সে কোনো বিষয়ের দলীল জানতে না চাইবে। আর যখন সে কোনো বিষয়ের দলীল জিজ্ঞেস করবে তখন সে আর মুক্বাল্লিদ থাকে না।

সুতরাং তাক্বলীদ জায়িযের পক্ষে এটা দিয়ে কিভাবে প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে? কোন বিবেকবান মানুষ কি কোন বস্তুকে সাব্যস্ত করতে পারে এমন বস্তুর দ্বারা, যা উক্ত বস্তুকে নিষিদ্ধ করে? এবং যেটা দ্বারা কোন বস্তুর অসারতা প্রকাশ পেয়েছে তার মাধ্যমেই উক্ত বস্তুর বিশুদ্ধতা নির্ণয় করতে পারে?

হে মুক্বাল্লিদগণ! আমরা শুধুমাত্র তোমরা (দলীল হিসেবে) যা নিয়ে এসেছ সেগুলো যার দিকে ইঙ্গিত করে, তার প্রেক্ষিতেই আশা করছি এবং বলছি: তোমরা যিকর সম্পর্কে আহলুয যিকর বা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর। আর তা (যিকর) হলো, আল্লাহর কিতাব ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত। আর সে অনুযায়ীই তোমরা আমল কর। আর তোমরা মানুষের মতামত ও (অযথা) বাদানুবাদ পরিহার কর। আর আমরা তোমাদেরকে সেই কথাই বলছি যা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَلا تسْأَلُون فَإِنَّمَا شِفَاء العِي السُّؤَال

তোমরা কী জিজ্ঞেস করবে না? কেননা না জানার চিকিৎসা তো কেবল জিজ্ঞাসা করা। আর এটা আল্লাহর কিতাব ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। অমুকের মতামত, অমুক মাযহাবের মতমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা নয়। যদি তোমরা কেবলমাত্র মতামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, তাহলে যারা তোমাদের ফাতাওয়া দেয় তারাও তোমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। যেমনটি আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাদীছে বলেছিলেন, তারা (নিজেদের মনমতো ভুল ফাতাওয়া দিয়ে) তাকে হত্যা করে ফেলেছে, আল্লাহ তাদেরকেও হত্যা করে ফেলুন (ধ্বংস করুন)।

আর ভাড়াটে শ্রমিকের পিতার সেই ঘটনার প্রশ্নটি ছিল এরূপ, তিনি আলিম ছাহাবীদের নিকট কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে মাসআলার হুকুম জানতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের ব্যক্তিগত মতামত ও মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি। আর প্রত্যেক আলিম তাঁকে এটাই (কুরআন ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত) জানিয়েছিলেন। আর আমরাও মুক্বাল্লিদের কাছে প্রত্যাশা করি যেভাবে ভাড়াটে শ্রমিকের পিতা জানতে চেয়েছিলেন, তারাও সেভাবেই জানতে চাইবেন। আর তিনি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ের ওপর আমল করেছিলেন যা তাঁকে জিজ্ঞাসিত আলিমগণ বর্ণনা করেছিলেন।

তবে সে (মুক্বাল্লিদ) নিজে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, সে তার ইমামের ব্যক্তিগত মতামত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করছে, তার (কুরআন ও সুন্নাহর) বর্ণনা সম্পর্কে নয়। সুতরাং সে যে বিষয়টিকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করছে সে অনুযায়ী এখানে দলীল তার বিরুদ্ধে, তার পক্ষে নয়। আল্লাহই সাহায্যকারী।

তৃতীয়ঃ তারা যেসব দলীল পেশ করে তার সারকথা হলো, প্রমাণিত হয়েছে যে, আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু কালালাহ্ - এর ব্যাপারে বলেছিলেন, আমি এ ব্যাপারে ফায়ছালা দিচ্ছি যদি তা সঠিক হয় তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি ভুল হয় তবে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ তা হতে মুক্ত। কালালাহ্ হলো ছেলে ও পিতা না থাকা। তারপর ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি আল্লাহর থেকে এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ করি যে আমি আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু -এর বিরোধিতা করব। আর ছ্বহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু -কে বলেছিলেন, আমাদের মতামত আপনার মতামতের অনুগামী।

আর ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’ঊদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু-এর কথাকে গ্রহণ করতেন।

আর ছ্বহীহ ভাবে প্রমাণিত যে, শা‘বী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ছাহাবীদের মধ্য থেকে ছয় জন ছাহাবী ফাতাওয়া প্রদান করতেন। তারা হলেন- ইবনু মাস’ঊদ, ‘উমার ইবনুল

খত্ত্বাব, ‘আলী ইবনু আবি ত্বলিব, যায়দ ইবনু ছাবিত, উবাই ইবনু কা’ব ও আবূ মূসা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুম।

আর তাদের তিনজন অন্য তিনজনের মতের সামনে নিজেদের মতকে প্রত্যাহার করতেন। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’ঊদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু তার মতকে প্রত্যাহার করতেন ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর কথার সামনে, আবূ মূসা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু প্রত্যহার করতেন ‘আলী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর কথার সামনে এবং যায়দ (ইবনু ছাবিত) রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু তার কথাকে প্রত্যাহার করতেন উবাই ইবনু কা’ব রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর কথার সামনে।

উত্তর- আর ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর কথার উত্তর হল, যে বলা হয়ে থাকে, আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর থেকেও ভুল হতে পারে বা ভুল সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হতে পারে, এ কথার স্বীকারোক্তি দিতে গিয়ে আবু বকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর বিরোধিতা করতে লজ্জাবোধ করতেন, অথচ আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর কথা পুরোপুরি সঠিক ছিল না এবং তিনি ভুল থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন না। আর এই বিষয়টি ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর কথা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা না গেলেও আবু বকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর সাথে একাধিক মাসআলাতে ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর বিরোধিতার কারণে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমনঃ দীন ত্যাগীদের বন্দীদের ব্যাপারে, যুদ্ধলব্ধ স্থাবর সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর সাথে ওমর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর মতানৈক্য; যেখানে উক্ত স্থাবর সম্পদ আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বণ্টন করে দিতেন আর ওমর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু ওয়াক্ফ করে দিতেন। রাষ্ট্রীয় ভাতা প্রদানের ব্যাপারে, আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু মনে করতেন তা সমানভাবে হবে, আর ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু মনে করতেন তা শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে হবে।

অনুরূপ খলীফাহ্ নির্বাচন করার ব্যাপারে, আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু খলীফাহ্ নির্বাচন করেছিলেন, কিন্তু ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু খলীফাহ্ নির্বাচন করেননি। বরং তিনি বিষয়টিকে শূরার উপর ন্যস্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, যদি আমি খলীফাহ্ নির্বাচন করি তবে আবূ বাকর

রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু খলীফাহ্ নির্বাচন করেছিলেন, আর যদি আমি খলীফাহ্ নির্বাচন না করি তবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খলীফাহ্ নির্বাচন করেননি।

উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। তবে আমি জানি যে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তিনি কাউকে সমতা বা বরাবর করেননি। তিনি খলীফাহ্ নির্বাচন করেননি। অনুরূপভাবে তিনি দাদা ও ভাইদের মাসআলাতেও আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর বিরোধিতা করেছিলেন।

সুতরাং তার (মুকাল্লিদ ব্যক্তির) কথার দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় যে, তিনি কালালাহ্ এর মাসআলায় আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর বিরোধিতা করতে লজ্জাবোধ করেন, যেমনটি তারা বলেছেন। তাহলে এ সকল বিরোধিতাগুলো তাদের বিরুদ্ধে যাবে। যেগুলো ছ্বহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি তার বিরোধিতা করেছেন, আর তিনি কোনো লজ্জাবোধ করেননি। সুতরাং এগুলোর ব্যাপারে তারা যে জবাব প্রদান করবে সেটাই আমাদের নিকট উক্ত মাসআলাতে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে দলীল।

স্পষ্ট ভাষায়: যখন তারা বলবে, এই সকল মাসআলায় তিনি তার বিরোধিতা করেছেন; কারণ তার ইজতিহাদ আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর ইজতিহাদের বিপরীত। আমরা বলবো, ঐ মাসআলায় তিনি ঐকমত্য পোষণ করেছেন, কারণ তার (আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর) ইজতিহাদ তার (‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর) ইজতিহাদ এর অনুকূলে ছিল। এখানে তাক্বলীদের কিছুই নেই।

অনুরূপভাবে এটাও প্রমাণিত আছে যে, ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু তার মৃত্যুর সময় স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, তিনি কালালাহ্ এর মাসআলায় কোনো সমাধান দেননি। আর তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি তা বুঝতে পারেননি। সুতরাং যদি তিনি আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর কথা মত কথা বলতেন তার তাক্বলীদ করে, যেমনটা তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি কালালাহ্ এর মাসআলায় কোনো সমাধান দেননি, আর তিনি এটাও

বলেননি যে, তিনি তা বুঝতে পারেননি। আর যদিও আমরা মেনে নেই যে, 'উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এ মাসআলায় আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এর তাক্বলীদ করেছেন। তবুও এটা দিয়ে কোন দলীল সাব্যস্ত হয় না; কেননা শুধুমাত্র ছাহাবীদের উক্তিসমূহের (যে বিষয়ে নিজস্ব মত দেওয়ার ক্ষেত্র রয়েছে) মাধ্যমে দলীল সাব্যস্ত না হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃত।

এছাড়াও এ কথা দ্বারা সর্বোচ্চ এটা সাব্যস্ত হতে পারে যে, কোন একজন ছাহাবী কোন একটি মাসআলাতে কোন একজন 'আলিম মুজতাহিদ ছাহাবীর তাক্বলীদ করা, সেই সাথে অন্যান্য মাসআলাতে তার বিরোধিতা করা। অথচ মুকাল্লিদরা যা করে সেখান থেকে এটার অবস্থান কোথায়? যখন তারা শরী'আতের সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্তে নির্দিষ্ট আলিমের তাক্বলীদ করে কোনরূপ দলীলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ এবং শুদ্ধ-অশুদ্ধ হওয়ার তোয়াক্কা না করেই।

মোটকথা যদি আমরা মেনেও নেই যে, উক্ত বিষয়টি 'উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এর পক্ষ হতে তাক্বলীদ ছিল তবে তা মুজতাহিদের জন্য দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে, যখন তিনি কোন একটি মাসআলাতে ইজতিহাদ করতে সক্ষম হননি, আর এ বিষয়ে অন্য কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদ বিদ্যমান রয়েছে। তাহলে সে ক্ষেত্রে মুজতাহিদের জন্য তাক্বলীদ করা বৈধ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উক্ত মাসআলাতে ইজতিহাদ করতে সক্ষম হবে আর পরিস্থিতিও (ইজতিহাদের সময় না থাকায়) সংকটময় হবে।

আর এটা অন্য মাসআলা মুক্বাল্লিদ যেমন ভেবে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছিল এটা সে রকম নয়। এ দলীল দ্বারা মুক্বাল্লিদ যেমনটি মনে করেছিল তা হলো, দীনের সকল বিষয়ে আলিমদের মধ্য হতে নির্দিষ্ট কোনো আলিমের তাক্বলীদ করা, আর তার কাছে দলীল জানতে চাওয়ার পরোয়া না করেই তার সকল মতামতকে গ্রহণ করা। আর কুরআন ও সুন্নাহ্ এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। আর যারা এ দু'টিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সাথে ধরে থাকে তাদের প্রতি আস্থাশীল থাকা, আর বিষয়টি তখন ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গুরুদেরকে তারা যেভাবে রব বানিয়ে ফেলেছে সেটারই নামান্তর, যার বিবরণ সামনে অচিরেই আসবে। অনুরূপভাবে যদিও ধরে নেওয়া হয় যে, যেমনটি তারা দলীল পেশ করে বোঝাতে

চেয়েছেন, তাহলেও এটা দ্বারা বোঝা যায় যে সকল মাসআলা থেকে কোনো একটা মাসআলাতে আলিম ছাহাবীদের তাক্বলীদ করার বিষয়টি খাস বা নির্দিষ্ট। তাদের সাথে অন্যদের মিলানো সঠিক হবে না। কেননা ছাহাবীদের মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি এমন একটি স্থানে পৌঁছেছে যার থেকে অন্যদের মর্যাদা কমে যাবে এমনকি তাদের মর্যাদা তাদের পরবর্তীদের চেয়ে উহুদ পাহাড়ের মতো। ছাহাবীদের পরবর্তীদের এক উহুদ পাহাড়ও ছাহাবীদের এক মুদের সমান হবে না। এমনকি অর্ধেকেরও সমান হবে না।[৪]

আর এটাও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের যুগটা শ্রেষ্ঠ যুগ।[৫] তাহলে আমরা তাদের সাথে কিভাবে অন্যদেরকে মিলাতে পারি? অনেক বড় বিপদ বা বাক-বিতণ্ডার পরেও আমাদের কাছে তোমরা (মুকাল্লিদগণ) আল্লাহর কিতাব থেকে বা তার রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ থেকে কোন নছ্ব (প্রমাণযোগ্য বিবৃতি) প্রদান করতে সক্ষম হওনি। আর কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতিত কোন দলীল নেই। আর যে ব্যক্তি পাপ থেকে মুক্ত নয়, তার কথা বা কাজ হতে তোমাদের এমনকি আমাদের জন্যও কোন দলীল নেই। কেননা আল্লাহ কোন দলীল পেশ করেননি তার কিতাব ছাড়া এবং তার রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষা ছাড়া। সুতরাং যে ব্যক্তি বোঝার সে এটা বুঝতে পেরেছে, আর যে জাহিল সে এটা বুঝতে ভুল করেছে। জাহিলকে (তার থেকে নিরাপদ থাকার জন্য তাকে) জানাই সালাম।

আর তারা দলীল হিসাবে পেশ করেছে, আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু-কে লক্ষ করে ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর উক্তি- আমাদের মতামত

---

[৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩। তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব হবে না।

[৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৫১। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (ছাহাবীগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ।

আপনার মতের অনুগামী। এটাই প্রথম ঘটনা নয় যে, তারা কোন ঘটনাকে তার বিপরীত অর্থে প্রমাণ হিসেবে নিয়ে এসেছে। তারা যদি সম্পূর্ণ ঘটনাটি দেখত তবে এ দলীল তাদের পক্ষে নয় বরং বিরুদ্ধে যেত।

ছ্বহীহ বুখারীতে এ প্রসঙ্গটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে, ত্বরিক্ব ইবনু শিহাব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আসাদ ও গত্বাফানের একটি প্রতিনিধি দল আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এর কাছে আসলো, তিনি তাদেরকে আল-হারবুল মুজলিয়াহ্ (সব সম্পদ নিয়ে বের হওয়া) ও আস-সালামুল মুখযিয়াহ্ (লাঞ্ছিত আত্ম-সমর্পন) এর মাঝে ইখতিয়ার দিলেন। তারা বলল, আমরা মুজলিয়াহ্ সম্পর্কে জানি, তবে মুখযিয়াহ্ কি তা জানি না। তখন তারা (মুসলিম সৈন্যদল) বললেন, আমরা তোমাদের থেকে তোমাদের ঘরবাড়ি, তোমাদের জমি ছিনিয়ে নেব। আর তোমাদের থেকে আমরা যা পাব তা গণীমত হিসাবে লাভ করব। আর তোমরা আমাদের থেকে যা পাবে তা ফিরিয়ে দেবে। আর তোমরা আমাদের নিহত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে রক্তপণ (দিয়্যাত) প্রদান করবে আর তোমাদের নিহত ব্যক্তিরা জাহান্নামী গণ্য হবে (অর্থ্যাৎ তারা কোন দিয়্যাত পাবে না)। আর তোমাদেরকে এমন ক্বওম হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হবে যারা উটের লেজ ধরে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খলীফাহ্ ও মুহাজিরদেরকে এমন বিষয় দেখাবেন যে, তারা তোমাদের 'উযর গ্রহণ করবেন। আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এ বক্তব্য পেশ করলে 'উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু দাঁড়িয়ে বলেন, আমি ব্যক্তিগত একটা মত পোষণ করি যা আপনার সাথে পরামর্শ করতে চাই, আপনি মুজলিয়াহ্ ও মুখযিয়াহ্ যুদ্ধের ব্যাপারে যা পেশ করেছেন তা খুবই চমৎকার। কিন্তু আপনি যা উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের নিহতরা দিয়্যাত পাবে এবং তোমাদের নিহতরা জাহান্নামী হবে, এ ব্যাপারে আমার মত যে, আমাদের নিহত ব্যক্তিরা আল্লাহর আদেশেই লড়াই করে নিহত হয়, তাই তাদের প্রতিদান শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই।

পরে সম্প্রদায়ের সকলে 'উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এর কথার অনুসরণ করল। এ হাদীছটিতে যা বর্ণিত হয়েছে তা তাদের বিরুদ্ধে। কারণ আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এর মতামতের কিছু অংশকে তিনি স্বীকার করেছেন, অপর কিছু অংশকে তিনি নাকচ করেছেন। এ হাদীছের কতিপয়

(বর্ণনার) শব্দ এমন উল্লেখ আছে, আমি ব্যক্তিগত একটা মত পোষণ করি আর আমাদের (বাকী) মত আপনার মতামতের অনুগামী। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নাই যে তিনি যা মনে করেন (তার মতামতের) কতিপয় বিষয় অনুসরণ করা অথবা সম্পূর্ণ বিষয় অনুসরণ করা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটা হচ্ছে মতামত ও যুদ্ধ বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তার সঠিকতা নিরূপণ করা, এটাকে তাক্বলীদ বলে না।

অনুরূপভাবে কখনো চুপ থেকে এড়িয়ে যেতে হয় কোনো বিষয়ে মতামতের ভিন্নতা থাকলে, আর এটা করতে হয় আমীর তথা শাসকদের একনিষ্ঠ অনুসরণ করতে যেয়ে, যে ব্যাপারের আদেশ স্পষ্ট প্রমানিত হয়েছে। আর সেসব ক্ষেত্রে বিরোধিতা করা ও অপছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে, যা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়ার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। হ্যাঁ, এসকল মতামত কেবল যুদ্ধের ব্যাপারে। দীনের কোনো মাসআলা এর ব্যাপারে নয়। আর যদি তা দীনের কোনো মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তা কেবল অনুসরণের ভিত্তিতে হবে।

মোটকথা যারা এরকম দলীল দ্বারা তাক্বলীদকে জায়িয সাব্যস্ত করতে চায়, এ সকল মিসকীন মুক্বাল্লিদগণ এর সান্তনা এমন বস্তুর মাধ্যমে যা তাদেরকে পুষ্টও করবে না আবার তাদের ক্ষুধাকেও নিবৃত করতে পারবে না। আর সকল অবস্থায় তারা যে সকল দলীল পেশ করে তা তাদের বিরুদ্ধে যাবে, তাদের পক্ষে দলীল হবে না। কেননা ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন যা তার ইজতিহাদের সাথে মিলেছে। আর যা তার ইজতিহাদের বিপরীত হয়েছে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আর অনুরূপভাবে উক্ত ব্যক্তি যা উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’ঊদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর কথা গ্রহণ করার ব্যাপার এবং অনুরূপ উক্ত ছয়জন ছাহাবীর অন্যদের কথা গ্রহণের বিষয়টি কোন নতুন বিষয়ও না, আবার এটাকে কেউ অপছন্দও করেননি। কেননা কোন একজন আলিম অন্য আলিমের সাথে যে কয়টি মাসআলাতে দ্বিমত পোষণ করেন, তার থেকে আরো বেশী মাসআলাতে তার সাথে

একমত হন, বিশেষ করে যখন তারা দু'জনেই ইজতিহাদের উচ্চতম পর্যায়ে অবস্থান করেন। তাই তাদের মধ্যকার মতবিরোধ সংখ্যা অত্যন্ত কমই হবে।

বিজ্ঞ আলিমগণ আরো উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু ১০০ (একশ) টির মতো মাসআলায় 'উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এর বিরোধিতা করেছেন। আর মাত্র চারটি মাসআলায় তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাহলে এখানে তাক্বলীদ কোথা থেকে আসলো? আর যারা তাক্বলীদকে জায়িয প্রমাণের জন্য এটাকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করলো তা কিভাবে সঠিক হবে? অনুরূপভাবে যে ছয়জন ছাহাবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা একজন অন্য জনের কথাকে গ্রহণ করতেন তারাও মূলত তাদের ইজতিহাদের সাথে মিললে তাদের অনুসরণ করতেন, তাক্বলীদ করতেন না।

তারা সকলে (উল্লেখিত ছয়জন ছাহাবী) এবং সকল ছাহাবী যখন তাদের নিকট কোনো সুন্নাত প্রকাশিত হতো তখন তারা কারো কথাকে আঁকড়ে ধরে থাকতেন না, সে যে কোনো ব্যক্তিই হোক না কেন। বরং তারা সুন্নাতকে মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকতেন। আর তাদের ব্যক্তিগত মতামতকে তারা দেয়ালের পিছনে নিক্ষেপ করতো। মুক্বাল্লিদের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য কোথায়? তারা তো যার তাক্বলীদ করে তার কথার সাথে কুরআন ও সুন্নাহ এর পরিমাপ করে না। আর তারা তো কখনও তার বিরোধিতাও করে না। যদিও তাদের নিকট অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে সে সুন্নাহ্-এর বিপরীত কাজ করছে। এ সত্ত্বেও কতিপয় ছাহাবী কর্তৃক কতিপয় ছাহাবীর অনুসরণ করাটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে (হাদীছ) রিওয়াতের ভিত্তিতে হয়েছে, তাদের রায় বা ব্যক্তি মতামতের ওপর ভিত্তি করে নয়। এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় তারা একজন অন্যজন সম্পর্কে জানতেন। তারা একে অপরের সাথে পরিচিত ছিলেন। আর এক ছাহাবী অন্য ছাহাবীর অবস্থা জানতেন। তাদের কোনো ভুল মতামত প্রকাশ পেলে তাদের বড় ছাহাবীগণ তা থেকে সাবধান করতেন এবং তা থেকে বিরত থাকতে বলতেন। অচিরেই এ বিষয়ে আলোচনা আসছে ইন-শা-আল্লাহ। তারা একে অন্যের রায় বা মতামত গ্রহণ করতেন যখন দলীল অনুপস্থিত থাকতো এবং ঘটনার (ব্যাপারে ইজতিহাদের) সময়ও অপর্যাপ্ত থাকতো।

অতএব তারা পরম্পর পরম্পরের সাথে আলাপ-আলোচনার পর কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। এ সত্ত্বেও তারা ভয়ে থাকতো। এ কারণে তাদের কেউ তার ব্যক্তিগত একক মতকে তাদের জামা‘আতের বিরুদ্ধে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন। এ বিষয়ে আবূ ‘উবায়দাহ্ আস-সালমানী রহিমাহুল্লাহ ‘আলী ইবনু আবি ত্বলিবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনার মতামত জামা‘আতের সাথে হওয়াটা আমাদের কাছে অধিক প্রিয় আপনার একাকী কোনো মত পোষণ করা থেকে।

চতুর্থঃ তারা আরো দলীল দিয়ে থাকে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِسنتِي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدِين المهديين من بعدِي

তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং আমার পরে হিদায়াত ও সুপথপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।[৬]

এটা ‘ইরবাদ্ব ইবনু সারিয়াহ্ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর হাদীছের একটা অংশ। এটা একটা ছ্বহীহ হাদীছ। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরো একটি হাদীছ আছে -

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

আমার পরে তোমরা দু’জনের অনুসরণ করবে- আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুও ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর।[৭] আর এ হাদীছটিও পরিচিত প্রসিদ্ধ, ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত।

উত্তর - রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে খুলাফায়ে রাশিদিন যা চালু করেছিলেন তা গ্রহণ করার ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

---

[৬] ছ্বহীহঃ সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৪২, তিরমিযী হা/২৬৭৬, আবূ দাঊদ হা/৪৬০৭, ইরওয়াহ ২৪৫৫।

[৭] ছ্বহীহঃ সুনানে তিরমিযী হা/৩৬৬২।

ওয়াসাল্লাম এর আদেশের কারণেই তা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং তারা যা চালু করেছেন সে অনুযায়ী কাজ করা ও তাদের কাজের আনুগত্য করা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ। আমাদের উচিত হলো খুলাফায়ে রাশিদীনের অনুসরণ করা আর আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু ও 'উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এর আনুগত্য করা। কিন্তু তিনি উম্মাতের আলিমদের থেকে কোনো আলিমের তৈরীকৃত কোনো রীতি-নীতির অনুসরণ করতে বলেননি। মুজতাহিদদের মধ্য থেকে কোনো মুজতাহিদের ব্যক্তিগত কোনো মতামতের অনুসরণ করার প্রতিও তিনি দিক-নির্দেশনা প্রদান করেননি।

মোটকথা আমরা খুলাফায়ে রাশিদীনকে অনুসরণ করি আর আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু ও উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এর অনুসরণ করি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশক্রমেই। কারণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার পরে আমার সুন্নাতকে ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, আমার পরে তোমরা আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুও উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এর অনুসরণ করবে। সুতরাং যাদের ব্যাপারে নছ্ব বর্ণিত রয়েছে তাদের বিষয় দিয়ে যাদের ব্যাপারে কোন নছ্ব নেই তাদের দলীল সাব্যস্ত করা তোমাদের জন্য কিভাবে বৈধ হতে পারে?

তোমরা কি মনে কর যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবূ হানীফার সুন্নাত, মালিকের সুন্নাত, শাফিঈর সুন্নাত, আহমাদ ইবনু হাম্বালের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা তোমাদের জন্য আবশ্যক যাতে তোমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়?

আর যদি তোমরা বল যে, আমরা খুলাফায়ে রাশিদীনের উপর মাযহাবের ইমামদেরকে ক্বিয়াস করছি, তাহলে তো এটা মহা আশ্চর্যের বিষয়! কিভাবে তোমরা এই কঠিন চড়াইয়ে আরোহণ করছো? তোমরা তো পিছিয়ে আসার স্থানে অগ্রসর হওয়ার ভয়ানক দুঃসাহস দেখাচ্ছ। কেননা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কেবল খুলাফায়ে রাশিদীনকে নির্দিষ্ট করেছেন। আর তাদের সুন্নাতকে অনুসরণের

ক্ষেত্রে নিজের সুন্নাতের মত করেছেন। একটি আদেশের দ্বারা কেবল তাদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এই হুকুম তাদেরকে অতিক্রম করবে না। যদি কাউকে এই হুকুমের খুলাফায়ে রাশিদীনের সাথে যুক্ত করা যেত, তবে সেক্ষেত্রে তাদের সাথে যারা (আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সহচার্য ও জ্ঞান লাভের দিক থেকে অংশীদার ছিলেন তারাই অগ্রগণ্য হত ঐ সমস্ত লোকদের উপরে যারা তাদের সাথে কোন একটি বৈশিষ্ঠ্যের দিক থেকেও সমান অংশীদার নয়। বরং এদের ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে 'ছারা' (মাটি) ও 'ছুরাইয়া' (একটি উজ্জল তারা বিশেষ) এর মত।

উক্ত বৈশিষ্ঠ্য যদি খুলাফায়ে রাশিদীনের জন্য খাছ ও তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকতো, তবে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সকল ছাহাবীদের থেকে তাদেরকে খাছ করতেন না। সুতরাং আমাদেরকে এই সমস্ত পরিবর্তন থেকে রেহাই দাও ইনসাফ যাকে অস্বীকার করে। হায়! (কতই না ভাল হত) তোমরা যদি এই দলীলের আলোকে খুলাফায়ে রাশিদীনের তাক্বলীদ করতে। অথবা তোমাদের উলামাদের কথার বিপরীতে তোমরা যদি তাদের থেকে যা ছ্বহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে তার তাক্বলীদ করতে। কিন্তু তোমরা তা করোনি, বরং তোমরা তাদের থেকে যা এসেছে তাকে দেয়ালের পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ, যখন তাদের কথা তোমাদের অনুসৃত কোনো আলিমের কথার বিপরীত হয়ে যায়। আর এ বিষয়টি একমাত্র অহঙ্কারী ও হটকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউই অস্বীকার করবে না।

বরং তোমাদের স্বভাব এমন হয়েছে যে, তোমাদের অনুসৃত কোনো ব্যক্তির কথার বিপরীত যদি স্পষ্ট কুরআনের কোনো আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত কোনো সুন্নাতও হয় তবে তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই অনুসৃত লোকের কথাকে তোমরা গ্রহণ করো। জমীনের বুকে অবস্থানকারী হে মুক্বাল্লিদগণ! তোমরা যদি এ বিষয়টিকে অস্বীকার করো তবে এগুলো তোমাদেরই কিতাব। তোমরা আমাদেরকে অবহিত কর যে, আলিমদের মধ্য হতে তোমরা কাদের অনুসরণ কর যেন আমরা তোমাদের কাছে আমরা যা বর্ণনা করেছি তা স্পষ্ট করে জানাতে পারি।

পঞ্চম: তারা একটি হাদীছ দিয়ে দলীল পেশ করতে চায়- তা হলো,

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

"আমার ছাহাবীগণ নক্ষত্র তুল্য তোমরা তাদের যাকেই অনুসরণ করবে হিদায়াত পাবে।"[৮]

উত্তর- এই হাদীছটি জাবির রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু ও ইবনু উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আর আল-জারহু ওয়াত তা'দীলের ইমামগণ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে, এ ব্যাপারে ছুহীহ কিছুই বর্ণিত হয়নি। এ হাদীছটি রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিতও নয়। আর হাদীছের হাফিযগণ এ ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন তা যথেষ্ট। যে ব্যক্তি এই হাদীছের সূত্র ও দুর্বলতার ব্যাপারে আরো অনুসন্ধান চালাতে চায়, সে এই শাস্ত্রের গ্রন্থগুলিতে তার দৃষ্টি দিতে পারে। মোটকথা এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত করা যায় না। অতঃপর যদি দলীল সাব্যস্তও হয় তবে হে মুক্বাল্লিদগণ! তোমাদের জন্য এতে কি আছে? এতে তো ছাহাবীদের মর্যাদা সাব্যস্ত হয়। এ বৈশিষ্ট্য তাদের ছাড়া অন্য কারো মাঝে পাওয়া যায় না। এ দলীল থেকে তোমরা কি চাও? আর তোমরা যার তাক্বলীদ কর, সে যদি তাদের মধ্যে (তোমাদের দৃষ্টিতে) অর্ন্তভুক্ত হয়, তবে তোমাদের সাথে আরো কথা বলার প্রয়োজন আছে। আর যদি তোমরা তাদের ছাড়া অন্যদের তাক্বলীদ করো তবে তোমরা তাদের সে বিষয় ছেড়ে দাও, যা তোমাদের পক্ষে নয়। আর শ্রেষ্ঠ যুগের লোকদের কথা বলা ছেড়ে দাও। এবং ঐ বিষয়কেই নিয়ে আসো, যে বিষয়ে তোমরা দলীল পেশ করতে চাও। এ হাদীছটি যদি ছুহীহও হতো, তা দ্বারা উদ্দেশ্যে হতো ছাহাবীদের কথাকে আঁকড়ে ধরা। এটা শুধু একারণেই হতো যে, তাদের কারো অনুসরণ করলে অধিক হিদায়াত পাওয়া যাবে মর্মে রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

---

[৮] মওযূ/জাল হাদীছ হা/৫৮: সিলসিলাহ আহাদিছীয দ্বঈফাহ ও ওয়াল মওযূআহ

সুতরাং আমরা (এতে করেও) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশকেই বাস্তবায়ন করতাম, তার কথার প্রতিই উদ্বুদ্ধ করতাম এবং তার সুন্নাতকেই অনুসরণ করতাম। কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এটাকে (ছাহাবীদের কথা আঁকড়ে ধরাকে) অনুসরণের জায়গা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন বিধায় এটির বাস্তবায়নও তার সুন্নাত। আর এটা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। সুতরাং আমরা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর উপর আমল করা থেকে বেরও হতাম না আবার তাকে ছাড়া আর কারো তাক্বলীদও করতাম না।

আমরা তো মহান আল্লাহর বাণী শুনেছি, তিনি বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ﴾

আর রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। [সূরা আল-হাশর ৫৯:৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ﴾

বলুন! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তবে আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, আর তোমাদের গুণাহসমূহকে ক্ষমা করবেন। [সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১]

আর এর মূল কথা হলো তিনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন তা আমরা গ্রহণ করব। আর ঐ ব্যাপারে আমরা তার অনুসরণ করব, আর অন্য কারো অনুসরণ করব না। এবং অন্য কারো উপরে এক্ষেত্রে নির্ভরও করব না। যদি তোমরা এই বৈশিষ্ঠ্যের মধ্যে কিয়াসের মাধ্যমে তোমাদের ইমামদেরকে শামিল করতে চাও তবে এর থেকে তোমাদের সৃষ্ট আর কোন আশ্চর্যজনক মিথ্যাচার ও অপবাদ নেই।

আর এর আগের আলোচনাতেই এর উত্তর গত হয়েছে। আর তাদের দলীলের উত্তর দিতে গিয়ে এই উত্তরের মতো উত্তর দেওয়া হয়- তা হলো, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, মুয়ায তোমাদের জন্য একটা সুন্নাত চালু করেছে, আর তা হলো সলাতের বিষয়ে। তা হলো - ইমামের সাথে যে ছলাত ছুটে গেছে তা শেষে আদায় করা। আর এ বিষয়টি তোমার কাছে অজানা নয় যে, মুয়ায রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর এ কাজটি সুন্নাত হিসেবে গৃহিত হয়েছে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথার কারণেই; শুধুমাত্র মুয়ায করেছেন বলে নয়। সুতরাং তার কাজটি হচ্ছে সুন্নাত সাব্যস্ত হওয়ার কারণ। আর তার কাজটি রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ছাড়া সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত হয়নি।

আর এটা স্পষ্ট বিষয়। অজানা কিছু নয়। “আমার ছাহাবীরা নক্ষত্র তুল্য” হাদীছটির এই উত্তরের মত উত্তর দেওয়া যায় ছাহাবীদের গুণাবলির ব্যাপারে ইবনু মাস’ঊদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর উক্তির মাধ্যমে, তা হলো- তোমরা তাদের হক (মর্যাদা ও অধিকার) সম্পর্কে জানবে, আর তাদের, আদর্শ আঁকড়ে ধরবে, কারণ তারা সরল সঠিক আদর্শের উপর ছিলেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত বিষয় সমূহের সারমর্ম হচ্ছে- এখানে এমন একটি জবাব প্রদান করা হয়েছে যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত:

(তোমাদের কর্তব্য হলো আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকা), (তোমরা আমার পরে দুই জনকে অনুসরণ করবে), (আমার ছাহাবীগণ নক্ষত্র তুল্য) এবং ইবনু মাস‘ঊদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর কথাসহ এই সকল হাদীছের জবাবকে শামিল করে। আর সেই জবাবটি হচ্ছে, তাদের অনুসরণ ও সুন্নাহ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে যে, অনুসরণকারী ও সুন্নাত পালনকারী তারা এটাকে যেভাবে এনেছে (তথা মেনেছে) সেভাবেই আনবে, তারা যেভাবে পালন করেছে সেভাবেই পালন করবে, আর তারা তো (ছাহাবীগণ) রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ও কাজের বিপরীতে কোন কথাও বলতেন না, আর কোন কাজও করতেন না।

সুতরাং তাদের অনুসরণ অর্থ স্বয়ং রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ। আর তাদের সুন্নাত গ্রহণ করার অর্থ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে গ্রহণ করা।

আর তিনি মানুষদেরকে এ কাজের নির্দেশনা দিয়েছেন, কারণ তারাই (ছাহাবীগণ) তার পক্ষ থেকে প্রচারকারী, এবং তার পরে আসা উম্মাতের কাছে তারই শরী‘আতের বর্ণনাকারী। জ্ঞান যদিও তাদের (দিকে সম্পর্কিত) হয়ে থাকে তবুও এ জ্ঞান রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আসা জ্ঞানের বর্ণনাসূত্র মাত্র। যেমন- ত্বহারাত (পবিত্রতা), ছলাত, ছিয়াম ও হাজ্জ ইত্যাদি কার্যক্রমের তারা বর্ণনাকারী মাত্র, কিন্তু এগুলো তাদের দিকে সম্পৃক্ত করার কারণ হচ্ছে এটি তাদের মাধ্যমেই বর্ণিত বা সম্পাদিত হয়েছে।

আর বাস্তবে তা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং তাদের অনুসরণ করার অর্থ হলো তার (রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) অনুসরণ করা, আর তাদের সুন্নাতের অনুসরণ করা মানে হলো রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ করা। আর যদি এ বিষয়টি তোমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে তবে তোমরা খুলাফায়ে রাশিদীনের ও বড় বড় ছাহাবীগণ যে ইবাদাতগুলো করতেন তার প্রতি লক্ষ করো। তাহলে তুমি জানতে পারবে যে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতেন তারা উক্ত কাজের বর্ণনা করেছেন মাত্র।

আর তারা যদি তার কোনো বিষয়ে মতানৈক্য করতেন তবে তা কেবল হাদীছের বর্ণনার ভিন্নতার কারণে। তাদের নিজস্ব কোনো মতামতের ভিত্তিতে নয়। আর তুমি তাদের কারো কাছ থেকে প্রকাশিত এমন কাজ খুব কমই পাবে যে তারা এক্ষেত্রে কেবল নিজস্ব মতামতের উপর নির্ভর করেছেন। বরং তুমি তা একেবারে পাবে না বললেই চলে, বিশেষত কাজটি যখন ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর যাদের তাদের সম্পর্কে জানা আছে তারা এ বিষয়টি ভালোভাবেই জানে।

এখান থেকে বোঝা গেল যে, হাদীছটির অর্থ হলো- রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ছাহাবীদেরকে (উদ্দেশ্য করে) অনুসরণের কথা

বলেছেন ঐসব বিষয়ে যা তারা তাকে এবং খুলাফায়ে রাশিদীনদের করতে দেখেছেন। কারণ তারা তার থেকে প্রচারকারী। তার সুন্নাত সম্পর্কে অবগত। সুন্নাতের অনুসরণকারী। সুতরাং তাদের থেকে সেসব কাজই প্রকাশ পাবে যা তার থেকে প্রকাশ পেয়েছিল।

এ কারণে বড় বড় ছাহাবীদের জামা'আত থেকে ছ্বহীহভাবে প্রমাণিত আছে যে, তারা মনগড়া কথা (রায়) ও যারা মনগড়া কথা বলে তাদেরকে তিরস্কার করতেন। তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের দিকেই দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। অন্য কোনো দিকে তথা নিজেদের কথার দিকেও দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন না। আর এটা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিদেরই জানা কথা, কারো অজানা নয়। আর তাদের ইজতিহাদের কথা যা আহলুল ইলম বা আলিমগণ তাদের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং তাকে তাদের রায় (নিজস্ব মতামত) হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলির কোনটিই কিতাব ও সুন্নাহর বাইরে যায়নি। হয়ত সেটা প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে। কখনো কখনো এমন ধারণা মনে হতে পারে যে সেটা কিতাব-সুন্নাহর বহির্ভূত, তবে যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে গভীর অনুসন্ধান করবে তার কাছে এ ধারণা প্রত্যাখ্যাত বলেই গণ্য হবে। আর যদিও অত্যন্ত স্বল্প কিছু এমন (উদাহরণ) পাওয়া যায়, তবুও তুমি দেখবে যে উক্ত ছাহাবী একারণে অত্যন্ত সমস্যা বোধ করতেন এবং বলতেন যে, তাদের এই ভুল থেকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ মুক্ত। এছাড়াও তারা বলতেন এই মত যদি ভুল হয় তবে তার সম্পর্ক তার নিজের দিকে ও শয়তানের দিকে আর যদি তা সঠিক হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ হতে। যেমনটা ইতিপূর্বে আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু থেকে কালালাহ্ এর তাফসীরে গত হয়েছে। আর যেমনটা তার থেকে ও অন্যদের থেকে দাদার নির্ধারিত অংশের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটা উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا﴾ এর তাফসীরে বলতেন। এ আলোচনাটুকু খুবই মূল্যবান। সুতরাং এটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা কর, উপকৃত হবে।

ষষ্ঠঃ তারা মহান আল্লাহর বাণী দ্বারা দলীল পেশ করে —

﴿أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ﴾

"তোমরা আল্লাহর, তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এবং তোমাদের উলুল-আমর বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আনুগত্য কর।" [সূরা আন নিসা ৪:৫৯]

তারা বলে উলুল-আমর হলো উলামাগণ। আর তাদের অনুসরণ করা মানে হলো তারা যে ফাতাওয়া প্রদান করেন ঐ বিষয়ে তাদের তাক্বলীদ করা।

উত্তর: উলুল-আমর এর তাফসীরে মুফাসসিরগণের দু'টি মত রয়েছে।

প্রথমটি হলো- তারা হলেন শাসকবৃন্দ।

আর দ্বিতীয়টি হলো- তারা হলেন আলিমগণ।

আয়াতেকারীমায় দু'টি দলের উদ্দেশ্যে নিতে কোনো বাঁধা নেই। তবে মুক্বাল্লিদদের এ উদ্দেশ্য নেওয়ার দলীল কোথায়? কারণ হলো কোনো আলেমের বা কোনো শাসকের আনুগত্য করা যাবে না, যদি না তারা শরী'আত অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেন। আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি বলেন, স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই।

এছাড়াও উলামাগণ জনসাধারণকে তাদের তাক্বলীদ পরিত্যাগ করার প্রতি দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আর তারা তাদের তাক্বলীদ করতেও নিষেধ করতেন। অচিরেই এ বিষয়ে চার ইমাম ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা আসবে।

সুতরাং তাদের তাক্বলীদ বাদ দেওয়াই তাদের অনুসরণ। যদিও আমরা মেনে নেই যে, কিছু কিছু আলেমগণ তাদের তাক্বলীদ করার প্রতি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করেছেন, তাহলে সেই আলিম আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে মানুষকে নির্দেশনা দানকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছের নছ্ব বিরোধী হওয়ায় তার আনুগত্য করা যাবে না।

আর আমরা বলব সে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী। কেননা সে এই সমস্ত সাধারণ মানুষ যারা দলীল বোঝে না, আবার হক্ব থেকে বাতিলকে আলাদাও করতে পারে না, তাদেরকে তাক্বলীদ আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দেয়। আর তাদের প্রতি তার এই নির্দেশনা তাদেরকে এটা মানতে বাধ্য করে যে, শুধুমাত্র তাদের তাক্বলীদকৃত আলেমদের মত থাকলেই (আল্লাহর) কিতাবের উপর আমল করা যাবে। সুতরাং তাদের ঐসব 'আলেমগণ কোনো আমল করলে তারাও তা করে আর তারা আমল না করলে তারাও করে না। কুরআন ও সুন্নাতে কি আছে তা তারা লক্ষ্য করে না। বরং তাক্বলীদের শর্ত হলো যে তাক্বলীদ করে সে তার ইমামের মতামতকে গ্রহণ করবে, তার বর্ণনা থেকে দূরে সরে যাবে না, আর কুরআন ও সুন্নাত সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করবে না। কেননা যদি সে কুরআন ও সুন্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তবে সে তাক্বলীদ মুক্ত হবে, কারণ সে দলীল তালাশ করেছে।

এককথায় যে সমস্ত বিষয়ে উলুল-আমরের আনুগত্য ওয়াজিব হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত এমন কার্যাবলী যেখানে জন-সাধারণকে একত্রিত হতে হয় এবং যেখানে তাদের মতামতের দ্বারাই উপকৃত হতে হয়। এছাড়াও অন্যান্য এমন বিষয় যেগুলো জীবন পরিচালনা, সামাজিক কল্যাণ লাভ ও দুনিয়াবী ক্ষতি হতে আত্মরক্ষা সংক্রান্ত বিষয় সমূহ। আর এটা অসম্ভব নয় যে, যে সকল বিষয়ে তাদের আনুগত্যকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা (মৌলিকভাবে) শরী'আতের কার্যাবলী নয়। কেননা যদি তাদের আনুগত্যের উদ্দেশ্য শরী'আতের কার্যাবলী হত, তবে তা তো আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য বলেই বিবেচিত হত। অনুরূপভাবে এটাও অসম্ভব নয় যে, তাদের আনুগত্য শরী'আত সংক্রান্ত বিষয়সমূহেও হতে পারে, যেমন: ঐচ্ছিক কোন দায়িত্ব, ফরজে কিফায়াহ অথবা কতিপয় ব্যক্তিকে ফরজে কিফায়ার ব্যাপারে তারা যদি বাধ্য করে তবে এগুলো পালন করা আবশ্যক হবে। সুতরাং এটা শারঈ নির্দেশ যার আনুগত্য আবশ্যক হবে।

মোটকথা হলো আয়াতে উল্লেখিত উলুল-আমর এর এই আনুগত্য হলো সেই আনুগত্য যা মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তা হলো শাসকদের

আনুগত্য করা যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেয় অথবা আদিষ্ট বিষয়টি স্পষ্ট কুফুরী হিসেবে দেখা না যায়। আর এ হাদীছটি কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ। আর এটা কোনো তাক্বলীদ নয়।

বরং এটা হচ্ছে এমন শাসকদের আনুগত্য - যাদের উপরে অজ্ঞতা প্রকট হয়েছে বা জ্ঞান থেকে দূরে অবস্থান করছে - যুদ্ধ পরিচালনা, সামরিক রীতিনীতি ও জনসাধারণের কল্যাণলাভ সংক্রান্ত কার্যাবলীর ক্ষেত্রে। আর নিরেট শারঈ বিষয় তো কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহর দ্বারাই যথেষ্ট।

সপ্তম- জেনে রেখ! এখানে আমরা যা উল্লেখ করলাম, তা হচ্ছে তাক্বলীদকে জায়িযকারীদের তাক্বলীদের পক্ষে প্রধান দলীল সমূহ। আমরা তার প্রত্যেকটিকে পেশ করে তার অসাড়তা প্রমাণ করেছি, যেমনটি ইতোমধ্যেই তুমি জানতে পেরেছ। আমরা যা লিপিবদ্ধ করলাম এগুলো ছাড়াও তারা অনুরূপ আরো কিছু দলীল পেশ করে যা আমরা এখনো উল্লেখ করিনি। যেমনঃ ছাহাবীগণ ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর তাক্বলীদ করেছেন, উম্মাহাতুল আওলাদ (মনীবের সন্তান জন্ম দিয়েছে এমন দাসী) বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া ও এক ত্বালাক্ব অন্য ত্বালাক্বের অনুগামী হওয়ার বিষয়ে। এটা এমন একটি মিথ্যা কথা যাতে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ ছাহাবীগণ এ দুই মাসআলাতেই মতভেদ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু এর সাথে একাত্বতা প্রকাশ করেছেন ইজতিহাদ হিসাবে তাক্বলীদ হিসাবে নয়। আবার কেউ কেউ তার বিরোধিতাও করেছেন। আর তার সাথে যারা একাত্মতা ঘোষনা করেছেন তারা তার কাছে দলীল জিজ্ঞেস করেছেন। আর তার থেকে হাদীছ (বর্ণনা) জানতে চেয়েছেন, আর মুক্বাল্লিদের বিষয় হলো সে দলীল তালাশ করে না। বরং ব্যক্তিগত মতামতকে গ্রহণ করে কুরআন ও হাদীছের দলীলকে পরিত্যাগ করে। আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে না সে মুক্বাল্লিদ নয়।

অষ্টম- তারা যা দলীল হিসাবে পেশ করে তার সারকথা হলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণের মাঝে থাকাবস্থায় তারা তার সামনে ফাতাওয়া দিতেন। আর এটা ছিল তাদের তাক্বলীদ।

এর উত্তর দেওয়া হয় এভাবে যে, তারা কুরআন ও সুন্নাতের দলীল দ্বারা ফাতাওয়া দিতেন। আর এটা তাদের থেকে রিওয়ায়াত (বা কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান বর্ণনা)। আর এতে কোনো সন্দেহ নাই ঐ ব্যক্তির কাছে যে ব্যক্তি বোঝে যে, রিওয়ায়াত (বা কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান সংক্রান্ত বর্ণনা) গ্রহণ করা তাক্বলীদ নয়। কারণ রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হলো দলীল গ্রহণ করা, আর তাক্বলীদ গ্রহণ করা হলো ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণ করা। রিওয়ায়াত বা কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান ও রায় বা ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণের মাঝে পার্থক্য হলো- কেননা রিওয়ায়াতকে গ্রহণ করা তাক্বলীদ নয় বরং এটা মুক্বাল্লীদের কর্মের বিপরীত। সুতরাং এটা মুখস্ত করে নাও। কারণ তাক্বলীদকে জায়িযকারীগণ এরকম আরো অনেক ভুল করে থাকে। তারা বলে, মুজতাহিদগণ তাদের কাছে সুন্নাত বা হাদীছ রিওয়ায়েতকারীদের মুক্বাল্লিদ। তারা আরো বলে, তাক্বলীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো মহিলার কথা গ্রহণ করা যে সে হায়িয থেকে পবিত্র হয়েছে। মুয়াযযিনের কথাকে গ্রহণ করা যে (ছলাতের) সময় হয়ে গেছে। অন্ধ ব্যক্তিকে কেউ কিবলার কথা বললে সে তা গ্রহণ করা। তারা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং (রাবীদের) সমালোচনাকারী ইমামদের জারহ্ ও তা'দীল বা ন্যায়পরায়ণতা ও ত্রুটির সাক্ষ্য গ্রহণ করাকেও। আর তোমার নিকট এটা অস্পষ্ট নয় যে, এটাতে তাক্বলীদের কিছু নেই। বরং এটা রিওয়ায়াত বা কুরআন ও সুন্নাতকে গ্রহণ করা, আর এটা রায় বা মতামতকে গ্রহণ করা নয়, যখন রাবী বা বর্ণনাকারীকে ছলাতের সময় হয়ে যাওয়া, পবিত্রতা অর্জন করা, কিবলার (দিক জানা) এসকল ব্যাপারে সংবাদ প্রদানকারী, সাক্ষ্যদাতা, রাবীদের সমালোচক ও ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য দানকারী আলিমদের কথা গ্রহণ অর্থ তাদের রিওয়ায়েত গ্রহণ করা, যেহেতু সে (তারা প্রত্যেকে) তাদের দেখা বিষয়ের রিওয়ায়েত (বর্ণনা) করেন এবং তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন না। যেমন: ছলাতের সময় সম্পর্কে সংবাদ প্রদানকারী এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, সে ওয়াক্তের নির্দিষ্ট আলামত সমূহের মধ্য থেকে একটি আলামত দেখতে পেয়েছে। ছলাতের সময় (ওয়াক্ত) হয়ে গেছে এই সংবাদ সে তার নিজস্ব মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রদান করে না। অনুরূপভাবে ত্বহারাত বা পবিত্রতার সংবাদপ্রদানকারিনী ও তার পবিত্রতার সাদা রঙের আলামত দেখেই তা বর্ণনা করে, সে যা চিন্তা করেছে সেই নিজস্ব মতামতের উপর

ভিত্তি করে নয়। এভাবে ক্বিবলা সম্পর্কে সংবাদদাতা। সে কেবল দিক বলে দিয়েছে অথবা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যেদিকটা সকল চক্ষুষমান ব্যক্তি অনুভব করতে পারে। সে তার নিজের মতো করে বানিয়ে বলেনি। অনুরূপভাবে সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তিও, কেননা সে যা অনুভূতি দ্বারা জেনেছে তা বর্ণনা করেছে। সে কিছু নিজের থেকে বানিয়ে বলেনি। মোটকথা রিওয়ায়াত বর্ণনার মাঝে ও রায় বা মতামতের মাঝে পার্থক্য এটা বড়ই স্পষ্ট বিষয় গোপন কিছু নয়। এটা সূর্যের মতো স্পষ্ট। আর যার কাছে এ দু'টির পার্থক্য একই মনে হবে তার অর্থই হচ্ছে ঐ ব্যক্তি নিজেকে কোনরূপ 'ইলমি বিষয়ে সম্পৃক্তই করেনি। তার বুঝ হলো পশুর বুঝ যদিও সে মানুষের খোলসে থাকে।

ইবনু খুওয়ায়িয মিনদাদ আল বাছরী আল-মালিকী রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাক্বলীদের পারিভাষিক অর্থ হলো, এমন কথার দিকে ফেরা যার উপর বক্তার কোনো দলীল নেই। আর এজন্যই শরী'আতে তা নিষিদ্ধ। আর বক্তা যা বলেছে তার ওপর দলীল থাকলে তাকে ইত্তিবা' বলা হয়। দীনে ইত্তিবা' গ্রহণ যোগ্য আর তাক্বলীদ অগ্রহণযোগ্য। আর খুব শীঘ্রই ইবনু আব্দুল বার ও অন্যান্যদের থেকে এজাতীয় কথা আসবে।

নবম- তাক্বলীদের কতিপয় অনুসারী এমন কথা বর্ণনা করে যা তাদের দাবিমতে তাক্বলীদ জায়িয হওয়াকে শক্তিশালী করে। যা বলে তার অর্থ হলো এমন, তাক্বলীদ যদি নাজায়িয হয় তবে ইজতিহাদ প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। আর এটা সাধ্যের অতীত কাজকে চাপিয়ে দেওয়া। কেননা মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থান বিভিন্ন ধরনের। তার মধ্য থেকে কিছু কিছু ইজতিহাদী, আর কিছু কিছু তা থেকে অপারগ। আর এ স্বভাবই বেশীরভাগ লোকের। যদি ধরা হয় যে, সবাই এটার যোগ্য, তাহলে সবাইকেই সেটা অর্জন করতে হবে। আর প্রত্যেকেই এই ওয়াজিব কাজ করতে গেলে তাদের জীবন-জীবিকা, যা একশ্রেণি অন্য শ্রেণির উপর নির্ভর করে হয়ে থাকে সেটা নষ্ট হবে, যার ফলে বেচে থাকা সম্ভবপর হবে না।

কেননা ইলম চর্চায় নিজেকে সর্বক্ষন ব্যস্ত রাখা ও এটা ব্যতিত অন্য কিছুতে সংশ্লিষ্ট না হওয়া ছাড়া কেউই ইজতিহাদের স্তরে সফল হতে

পারবে না। আর যদি কৃষক-চাষী, তাঁতী, রাজমিস্ত্রী ও এরকম অন্যান্যরাও ইলমী ইজতিহাদে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে এসব কাজগুলো জনশূণ্য হয়ে পড়বে যার ফলে সুষ্ঠু জীবন যাপন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যা বাস্তব জীবনের অবকাঠামোকে বিনষ্ট করা এবং মানুষের মধ্যকার জাগতিক শ্রেণিবিন্যাসকে দূরীভূত করার প্রতি ধাবিত করবে। যেখানে ক্ষতি ও জটিলতা আবশ্যক হবে। আর এটা কারো কাছে অস্পষ্ট নয় যে, এটা শরী‘আত প্রণেতার উদ্দেশ্যের বিপরীত।

আর এ অকেজো অভিযোগের জবাব দেওয়া হয় এভাবে যে, আমরা প্রত্যেক বান্দার কাছ থেকে এটা দাবি করি না যে, সে ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছে যাবে, বরং আমাদের কাঙ্খিত বিষয় হলো তাক্বলীদ না করা। আর এটা এভাবে যে, এসব দায়িত্ব যারা পালন করবেন আর যারা জ্ঞানগরীমায় কম হওয়ার কারণে (তাদের অনুসারী) তাদের দৃষ্টান্ত হলো যেমনটি তাদের অনুরূপ শ্রেণি ছাহাবী, তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈদের যুগেও ছিল, যারা ছিল উত্তম যুগের মানুষ এবং তারপরের যুগের মানুষও। আর একথা সকল আলেমই জানে যে তারা কেউ মুক্বাল্লিদ ছিল না।

তারা কোনো উলামাদের দিকে সম্পৃক্ত করতেন না। বরং না জানা ব্যক্তি কুরআন ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহতে প্রতিষ্ঠিত শরী’আতের বিধান সম্পর্কে জানা ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতো। সুতরাং তিনি ঐ ব্যাপারে ফাতাওয়া দিতেন ও শাব্দিকভাবে অথবা অর্থগতভাবে তাকে বর্ণনা করতেন। যার ফলে সে রিওয়ায়াত বা কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে সে আমল করতো, রায় বা মতামতের ভিত্তিতে নয়। আর এটা তাক্বলীদের চেয়ে বেশি সহজ।

কারণ রায় বা ব্যক্তিগত মতামতের সূক্ষ বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা রিওয়ায়াত বা কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান অর্জনের চেয়ে বেশি কঠিন। সুতরাং আমরা এসব সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাক্বলীদে বাধ্য করা লোকদের থেকে তুলনামূলক সহজ বিষয়টিই দাবি করি।

আর এটা এমন পদ্ধতি যা ছিল সর্বোত্তম যুগের মানুষের, তার পরে যারা এসেছেন তাদের, তারপরে যারা এসেছেন তাদের। এরপর শয়তান ধীরে ধীরে তাক্বলীদের রাস্তা খুলে দিয়েছে। যারা এ রাস্তায় চলেছে আর চলা

অব্যাহত রেখেছে তারা নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করেনি যতক্ষণ না তারা নিজেদেরকে কোনো একক আলিমের তাক্বলীদের ওপর আবদ্ধ রেখেছে। আর অন্য কারো তাক্বলীদ করাকে তারা জায়িয মনে করে না। তারপরে তারা এ ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। আর প্রত্যেক দলই মনে করে যে, সত্য কেবল তা যা তাদের ইমাম বলেছেন। আর তা ছাড়া যা কিছু আছে তা বাতিল। তারপর পরষ্পরের মাঝে শুরু হয় শত্রুতা ও বিদ্বেষ এমনকি তুমি বিভিন্ন মাযহাবের মাঝেও শত্রুতা দেখতে পাবে। যা তুমি বিভিন্ন ভ্রান্ত দলের বা ধর্মের মাঝে দেখতে পাবে না। আর একথা সবাই জানে যারা তাদের ব্যাপারে জানে। সুতরাং তুমি এসব শয়তানি বিদ'আতকে দেখ যা এই সম্মানিত জাতিকে বিভিন্ন দল উপদলে ভাগ করে দিয়েছে। আর তাদেরকে পরিচালিত করেছে বিভিন্ন মতে, সম্পর্কচ্ছেদে ও বিরোধিতায়।

সুতরাং যদি এই তাক্বলীদ ও বিদ'আতী মাযহাব জনিত ক্ষতি না হতো তাহলে ইসলামের মাঝে এত বিভক্তি হতো না। তারা একই দলভুক্ত থাকতো ও একই নাবী ও একই কিতাবের অনুসারী থাকতো। এটাই তার জায়িয না হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। আর ঐক্যবদ্ধ হতে আদেশ করেছেন। তিনি দীনে বিভক্তকারীদেরকে নিন্দা করেছেন। এমনি তিনি কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে বলেছেন - যা হলো সর্বোত্তম আনুগত্য- যখন তারা মতানৈক্য করতো তখন তারা (অন্যান্য মানুষ) তিলাওয়াত ছেড়ে দিত। তাদের মনসংযোগ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তারা সর্বদা তিলাওয়াত করতেন। অনুরূপভাবে আল কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় বিভক্ত হওয়া ও মতানৈক্য করাকে নিন্দা করা হয়েছে। সুতরাং কিভাবে একজন আলেমের একথা বলা বৈধ হতে পারে যে সেই তাক্বলীদ বৈধ যা মুসলিমদের বিভক্তির কারণ? আর তাদের শৃঙ্খলা ও সম্পর্ককে আলাদা করে যদিও তারা নিকট আত্মীয় হয়ে থাকে তবুও!

দশম- কতিপয় মুক্বাল্লিদ দলীল পেশ করে- কতিপয় তাক্বলীদে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ এবং যে ব্যক্তি তাক্বলীদের পরিবার হতে বের হতে পারেনি, যদিও সে মনে করে যে, সে বের হয়ে গেছে, তবুও তারা (উভয় দল) তাক্বলীদ জায়িয হওয়ার বিষয়ে ইজমার দাবি করে। এটা এমন দাবি যা

শরী‘আতের জ্ঞানে জ্ঞানী কোনে ব্যক্তি হতে প্রকাশ হতে পারে না। বরং জ্ঞানীদের কথা জানে এমন ব্যক্তিও প্রকাশ করে না। বরং চার মাযহাবের ইমামদের উক্তি জানে এমন কোনো ব্যক্তি হতেও এমন কথা প্রকাশ হতে পারে না। কেননা ছ্বহীহভাবে তাদের থেকে তাক্বলীদের নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

أَقْوَال الْعلمَاء فِي النَّهْي عَن التَّقْلِيد

তাক্বলীদ নিষেধের ব্যাপারে ‘উলামাদের উক্তিসমূহ

ইবনু ‘আব্দুল বার বলেন, তাক্বলীদের বিভ্রান্তির ব্যাপারে বিভিন্ন যুগের ইমামদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। তিনি যে ব্যক্তি তাক্বলীদকে সাব্যস্ত করে এবং তাকে আবশ্যক বলে, তাক্বলীদ জায়িয হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির বাতিল ধারণাকে খণ্ডনে তিনি বিস্তারিত একটি আলোচনা পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাক্বলীদের কথা বললে তাকে বলা হবে তুমি কেন তাক্বলীদের কথা বলছ আর এ বিষয়ে সালাফের বিরোধিতা করছ? কেননা তারা তো তাক্বলীদ করেননি।

যদি তুমি বলে থাক, আমি তাক্বলীদ করেছি কেননা আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই এবং আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও আমি আয়ত্ব করতে পারিনি। আর আমি যার তাক্বলীদ করেছি তিনি উক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন, সুতরাং আমি আমার থেকে জ্ঞানী ব্যক্তির তাক্বলীদ করেছি।

(তখন) তাকে বলা হবে, যখন আলিমগণ কোনো বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো ঘটনার বিষয়ে একমত

পোষণ করেন অথবা কোনো বিষয়ে তাদের মতামত এক রকম হয়ে যায়, তখন সেটাই হলো হক্ব বা সত্য, এতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে তুমি যদি তারা যে ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন, সেক্ষেত্রে কোনো আলিমকে রেখে কোনো আলিমের তাক্বলীদ করার ব্যাপারে তোমার দলীল কী? আর তারা সকলেই তো আলিম। আর এটাও তো হতে পারে তুমি যার মাযহাবে আছো তার থেকে বেশি জানা কোনো আলিমের কথা থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। যদি সে (মুক্বাল্লিদ) বলে, আমি তার তাক্বলীদ করি কারণ আমি জেনেছি সে সঠিক পথে আছে। তাহলে আমি তাকে বলবো, তুমি কি এটা কুরআন, সুন্নাত অথবা ইজমা দ্বারা জেনেছ যে, এটা সত্য? সে উত্তরে যদি বলে, হ্যাঁ। তবে তাক্বলীদ বাত্বিল হয়ে যাবে। আর তখন তার কাছে দাবি অনুযায়ী দলীল চাওয়া হবে।

আর যদি সে বলে, আমি তার তাক্বলীদ করি কারণ সে আমার চেয়ে বেশি জানে। তবে তাকে বলা হবে যারা তোমার চেয়ে বেশি জানে তুমি তাদের সকলের তাক্বলীদ করো? এমন হলে তো তুমি অনেককে এমন পাবে যারা তোমার চেয়ে বেশি জানে। তখন তুমি কার তাক্বলীদ করবে তা নির্দিষ্ট করতে পারবে না। কেননা এ ব্যাপারে তোমার জ্ঞান রয়েছে যে, (তারা প্রত্যেকে) তোমার চেয়ে জ্ঞানী। আর যদি সে বলে যে, উম্মাতের মধ্যে সে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই তার তাক্বলীদ করেছি। তাহলে তাকে বলা হবে, তাহলে সে কি ছাহাবীদের থেকেও বেশি জানে? আর এটাই তার নিকৃষ্টতর কথা হিসেবে যথেষ্ট হবে। ... ইবনু 'আব্দুল বার এর কথা এখানেই শেষ করছি। (আর) যা আমি তার কথা হতে যা উদ্ধৃত করতে চেয়েছি তার বর্ণনা অনেক লম্বা। তিনি এগুলোকে তাক্বলীদের বিভ্রান্তির উপর আলিমদের ইজমার বর্ণনা দিতে যেয়ে তা বর্ণনা করেছেন, আর চার ইমাম অবশ্যই তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

ইবনুল ক্বইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ ইমাম আবূ হানিফা রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আবূ ইউসূফ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা উভয়েই বলেছেন, কারও জন্য বৈধ নয় আমাদের কথা দ্বারা কথা বলা, যতক্ষণ না সে জানে যে আমরা তা কোথা থেকে বলেছি। তাক্বলীদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এটাই স্পষ্ট কথা। কারণ যে দলীল জানে সে মুজতাহিদ, সে দলীল অনুসন্ধানকারী, মুক্বাল্লিদ নয়। কারণ যে কথা গ্রহণ করে ও দলীল

অনুসন্ধান করে না সেই মুক্বাল্লিদ। ইবনু 'আব্দুল বার রহিমাহুল্লাহও বর্ণনা করেন মা'আন ইবনু ঈসা থেকে মুত্তাসিল সানাদে তিনি বলেন, আমি ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ- কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল-সঠিক উভয়টিই করি, সুতরাং তোমরা আমার মতামতগুলো লক্ষ্য করো। যা কিতাব ও সুন্নাতের অনুযায়ী হবে তা গ্রহণ কর আর যা কিতাব ও সুন্নাতের অনুযায়ী হবে না তা পরিহার কর।

আর তোমার নিকট গোপন নয় যে, এটা তার তাক্বলীদ নিষিদ্ধের ব্যাপারে তার থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্য। কেননা তার কথার যে অংশ কিতাব ও সুন্নাতের সাথে মিলে যাবে সে অনুযায়ী আমল করা মূলত কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী 'আমল করা। এটা তার দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। আর তিনি তার অনুসারীদেরকে তার সেসব আদেশ মানতে নিষেধ করেছেন যা কিতাব ও সুন্নাতের অনুযায়ী হবে না। আর সানাদ ইবনু 'আনান আল-মালিকী 'মুদাওয়ানাতু সাহনূন' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, যা উম্ম নামে পরিচিত। তার শব্দ এরূপ- শুধুমাত্র তাক্বলীদের ওপর থেমে থাকাতে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তিনি আরো বলেন, মুক্বাল্লিদ ব্যক্তির অন্তর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয় না, আর সে প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা বিশেষায়িতও হয় না। যেহেতু সকল বিজ্ঞজনের ঐক্যমতে তাক্বলীদ ইলমের কোন রাস্তা নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ﴾

"আপনি মানুষের মাঝে সত্য দ্বারা বিচার করুন।"[সূরা সাদ ৩৮:২৬]

তিনি বলেন,

﴿فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ﴾

"আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন।" [সূরা ক্বছাছ: ৭৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ﴾

"যে বিষয়ে আপনার কোনো জ্ঞান নেই আপনি তার পিছনে পড়বেন না।" [সূরা ইসরা: ৩৬] তিনি আরও বলেন,

﴿وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

"আর তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কথা বলো যা তোমরা জান না।" [সূরা আল-বাক্বারাঃ ১৬৯]

আর জানার বিষয় হচ্ছে, ইলম (জ্ঞান) হলো কোনো জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা। আমরা মুক্বাল্লিদকে বলব, যখন কথাসমূহ ভিন্ন হবে ও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হবে, তখন কোথা হতে তুমি জানতে পারবে যে, তুমি যার তাক্বলীদ করেছ তার কথা অন্যদের থেকে বিশুদ্ধ? অথবা কোন একটি আমল অন্য আমল থেকে বিশুদ্ধ (অথবা তার নৈকট্য অন্যদের নৈকট্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)। এখানে যে কথাই আসুক না কেন তা তার বিপরীতে যাবে, যখন সেটি তার তাক্বলীদ করা বা নৈকট্যভাজন ইমামের মাযহাবের বিশেষত্বের ব্যাপারে প্রয়োগ করা হবে। এভাবে করে সে কতিপয় ছাহাবী ইমামদেরও বিরুধিতা করার ব্যাপারে বলে ফেলবে।

কারণ তাক্বলীদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, দলীল ছাড়া কোনো ব্যক্তির কথাকে গ্রহণ করা। তাহলে তাক্বলীদের মাধ্যমে ইলম কোথা থেকে অর্জিত হবে? যার কোনো সুনিশ্চিত দলীল নাই। উপরন্ত এটা নতুন আবিষ্কৃত বিদ'আত। কারণ আমরা অকাট্যভাবে জানি যে, ছাহাবীদের সময়ে ও যুগে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাযহাব ছিল না, যাকে তারা গ্রহণ করবে ও তাক্বলীদ করবে। তারা কোনো সমস্যার সমাধান করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতেন। তারা দলীল না পেলে তাদের নিজেদের মাঝে আলোচনা করে নিতেন। অনুরূপভাবে তাবিঈগণও কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরতেন। তারা কোনো দলীল না পেলে দেখতেন ছাহাবীগণ কোন বিষয়ের উপরে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যদি এটাও না পেতেন তবে তারা নিজেরা ইজতিহাদ করতেন। এ ক্ষেত্রে

তাদের কেউ কেউ ছাহাবীর কথাকে গ্রহণ করতেন এবং সে মতটিকে তারা মহান আল্লাহর দীনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী মনে করতেন।

এরপর আসল তৃতীয় যুগ। এ যুগে ছিল আবূ হানিফা, মালিক, শাফিঈ ও ইবনু হাম্বল রহিমাহুমুল্লাহ। মালিক মৃত্যু বরণ করেন ১৭৩ হিজরীতে। আবূ হানিফা রহিমাহুল্লাহ মৃত্যু বরণ করেন ১৫০ হিজরীতে। আর এ বছরে জন্মলাভ করেন ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ। আহমাদ ইবনু হাম্বল জন্মলাভ করেন ১৬৪ হিজরীতে। তারা তাদের পূর্ববর্তীদের মানহাযে ছিলেন। তাদের যুগে এমন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির কোনো মাযহাব ছিল না যে, তারা [শুধুমাত্র] তার দারস গ্রহণ করতেন। তারা তার নিকটে অবস্থান করতেন। মালিক এবং তার মত অনেক ইমামের কথাকে তার অনুসারীরা বিরোধিতা করেছেন। যদি আমরা সবগুলো একত্রিত করি তবে কিতাবের আসল উদ্দেশ্য থেকে বাইরে চলে যাব। তাদের ইজতিহাদের উপকরণ ও ইসতিম্বাত্ব এর সক্ষমতাকে একত্রিত করার লক্ষ্যে এ প্রচেষ্টা। আল্লাহ তার নাবীর কথাকে সত্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ। এরপর যে যুগ আসবে। এরপর যে যুগ আসবে। তিনি তার যুগ উল্লেখ করার পর দু'টি যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। আর এ হাদীছটি ছুহীহ আল বুখারীতে এসেছে।

তাক্বলীদকারীদের যে বিষয়টি আশ্চর্যের তা হলো, এটা অনেক পুরাতন বিষয় এর উপর আমরা আমাদের শায়খদেরকে পেয়েছি। আসল ব্যাপার হলো তা একটা বিদ'আত। তা হিজরী দু'শত বছর পরে চালু হয়েছে। যে যুগের প্রশংসা নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন সে যুগ শেষ হওয়ার পর। আর তুমি ইতোমধ্যেই এটা জানতে পেরেছ যে, সর্বোত্তম যুগ ও তার পরের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এ তাক্বলীদ চালু হয়।

আর চার ইমামের মাযহাব দ্বারা মাযহাব প্রথা চালু হয় চার ইমামের পরে। তারা তাক্বলীদ ও এটা নিয়ে আত্মগরিমায় লিপ্ত হওয়াকে বর্জনের ক্ষেত্রে তাদের পূর্বে গত সালাফদের রীতির উপরেই ছিলেন।

বরঞ্চ এ মাযহাব প্রথা চালু করেছে সাধারণ মুক্বাল্লিদগণ তাদের নিজেদের জন্য। এ ব্যাপারে তারা মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামদের অনুমতি গ্রহণ করেননি।

ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ থেকে ধারাবাহিকভাবে (মুতাওয়াতির ভাবে) বর্ণিত হয়েছে যে, খলীফা রশীদ রহিমাহুল্লাহ তাকে বলেন, তিনি (রশীদ) ইচ্ছা পোষণ করেন যে তার (ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ এর) মাযহাবে লোকদেরকে একত্রিত করবেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি (ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ) তাকে (রশীদকে) নিষেধ করেন। আর ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ এর জীবনী লেখা আছে এমন প্রায় প্রত্যেকটি কিতাবে এ বর্ণনাটি পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে না এমন কিতাব খুব কমই আছে।

যখন এটা স্বীকৃত যে, এসব মাযহাব তৈরীকারী ব্যক্তি ও তাক্বলীদের বিদ‘আত প্রচলনকারীরা হচ্ছে শুধুমাত্র সাধারণ মুকাল্লিদগণ। আর তুমি উসূলের সাব্যস্ত হওয়া বিষয় হতে এটা জানতে পেরেছ যে, ইজমা’ হওয়ার ক্ষেত্রে এসকল লোকের কোন অংশ নেই। বরং ইজমার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে শুধুমাত্র তারা যারা মুজতাহিদ। আর একই সময়ে কোন মুজতাহিদদের কোন আলিমও এই তাক্বলীদের ব্যাপারে কিছু বলেননি।

এই বিদ‘আত চালু হওয়ার আগে তো এটা স্পষ্ট, আর এটা চালু হওয়ার পরেও আমরা কোন মুজতাহিদকে বলতে শুনিনি যে, সে এসব মুকাল্লিদ যারা আল্লাহর দীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে, মুসলিমদের বিভক্ত করেছে তাদের এ কাজকে অনুমোদন করেছেন। বরং বড় আলিমরা এটাকে অপছন্দ করেছেন তবে তারা এটার বিষয়ে চুপ থেকেছেন তাক্বিয়ার কারণে চুপ থাকার ন্যায়, সেটা হয়তো ক্ষতির আশংকায়, নয়তো কোন (বিশেষ) উপকার হারানোর ভয়ে, যার দৃষ্টান্ত প্রচুর। এ কাজটি বিশেষ করে মন্দ পাপিষ্ঠ আলিম সমাজ থেকে ঘটেছে। আর প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এটা জানে যদি ইসলামের কোনো মুজতাহিদ আলিম ইসলামের শহর সমূহের কোনো শহরে অর্থাৎ যে কোনো স্থানে একথা স্পষ্ট ভাষায় বলে যে, তাক্বলীদ বিদ’আত, হারাম, লাগাতার তা মেনে চলা ও তা নিয়ে আত্মম্ভরিতা করা জায়িয নেই। এ কথা বলা মাত্রই সেখানের সকল লোক তার বিরোধিতা না করলেও অধিকাংশ লোক তার বিপক্ষে কথা বলবে,

তাকে লাঞ্ছিত করবে, তার সম্পদের ক্ষতি করবে, তার শরীর ও সম্মানেরও ক্ষতি করবে তার থেকে নিচের ও অযোগ্য লোকেরাই। যখন (এটার কারণে) রক্ষা পাওয়া যায় মুকাল্লিদদের প্রধান অজ্ঞ ব্যক্তি ও তাদের সহায়তাদানকারী মুর্খ রাজা-বাদশা ও সৈন্য-সামন্তের হাতে নিহত হওয়া থেকে। কারণ শরী'আতের 'ইলমের ব্যাপারে মূর্খদের আচরণ প্রায় একই ধরনের। মূর্খতার ক্ষেত্রে যারা তাদের মতের মতো কথা বলে তাদের কথাকে তারা সাদরে গ্রহণ করে। আর তাদের মতের বিপরীত মতকে তা সত্য হলেও তারা বিরোধিতা করে। আর এ কারণেই সকল ইসলামী দেশে এ বিদ'আতে ছেয়ে গেছে এবং তা সর্বত্র সকল মুসলিম জনতার মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুতরাং মূর্খ ব্যক্তি (জাহিল) বিশ্বাস করে যে, দীন সর্বদা এরকমই ছিল এবং হাশরের (দিন) পর্যন্ত এমনই থাকবে। আর সে ভালো বিষয়ের জ্ঞানও রাখে না এবং মন্দ বিষয়কে অপছন্দও করে না। আর এরকমই আচরণ করে যারা তাক্বলীদের জ্ঞানে ব্যস্ত থাকে। সে মূর্খের (জাহিলের) মত। বরং তার চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট।

কেননা সে তার মুর্খতা, তাক্বলীদের বিদ'আতকে পুনরাবৃত্তি ও মুর্খ লোকদের চোখে (বিদ'আতী কাজের) সৌন্দর্য তুলে ধরার সাথে যোগ করে মুহাক্বিক্ব উলামা এবং কুরআন ও নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা।

তাদের বিরোধিতায় নিয়োজিত থাকে ও এ নিয়েই ঘোরাঘুরি করে। আর তাদেরকে বিদ'আতের সাথে সম্পৃক্ত করে। তারা আলিমদের বিরোধিতা করে। তারা তাদের মান-মর্যাদাকে খাটো করে।

আর তাদের (মূর্খ মুক্বাল্লিদদের) থেকে তাদের রাজা তাদের নিয়োগকৃত প্রশাসন ঐ বিষয় শোনে। সুতরাং তারা তাকে সত্যায়ন করে এবং তার কথা মেনে নেয়, এর কারণ হচ্ছে তারা অজ্ঞতার দিক হতে তাদের সমপর্যায়েরই।

আর যদি সে মুক্বাল্লিদ হিসাবে কিছু মাসআলা মাসায়েল জানেও তবুও সে জানে না যে এটা কি সত্য না মিথ্যা। বিশেষ করে যদি সে বিচারক হয় বা

মুফতী হয়। কারণ সাধারণ মানুষ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখে না যে কে মুহাক্কিক্ব আলিম ও কে মূর্খ (জাহিল)। আবার এটাও দেখে না যে, কার মধ্যে পূর্ণতা আছে আর কার মধ্যে কমতি আছে। কেননা সে ব্যক্তি তো তার নিজের (তাক্বলীদকৃত) ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন সম্মানী ব্যক্তির সম্মান করতে জানে না। আর মূর্খ (জাহিল) ব্যক্তি ইলমের (জ্ঞানের) মোকাবেলায় দলীল পেশ করে ক্ষমতা দ্বারা, প্রশাসনের সহায়তা দ্বারা মুক্বাল্লিদ শিক্ষকদেরকে একত্রিত করার দ্বারা এবং বিতর্কিত ফাতাওয়া সমূহ সংকলন করার দ্বারা। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুক্বাল্লিদগণের নেতৃবৃন্দ এরূপ করে থাকে। যেমনটা পূর্ব যুগের ও বর্তমান যুগের মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে প্রত্যেক আলিম ব্যক্তিই তা জানে।

আর এ বিষয়টি মানুষেরাও তাদের নিজেদের যুগে স্বচক্ষে দেখে ও তাদের পূর্ব যুগের সঠিক ইতিহাসের কিতাব অধ্যায়ন করে জানতে পারে।

আর মুহাক্কিক মুজতাহিদ আলিমগণ বেশির ভাগ সময়ে দুর্বল হয়ে থাকেন।

যখন তাদের মাঝে আর জাহেলদের মাঝে বড় ধরণের ব্যবধান তৈরী হয়ে যায়, তখন তারা অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে যায়, এই পক্ষ ঐ বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয়না, আর ঐ পক্ষ এই বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয় না। নির্বোধ এর তুলনায় ফক্বীহ এর মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ, যেরূপ মর্যাদা ফক্বীহ এর তুলনায় নির্বোধ ব্যক্তির! কারণ, এক পক্ষ অপর পক্ষের বিষয়ে অনাগ্রহী, আর অপর পক্ষ বিপরীত পক্ষের বিষয়ে তার চেয়েও অধিকতম বিরাগী। আর যে বিষয়টা আলেমদেরকে বড় বড় আলেমদের তাক্বলীদ পরিত্যাগ করতে এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে নিয়ে যায়, তা হল, তারা তাদেরকে ইলমুত তাক্বলীদ এর বিষয়ে অনাগ্রহী দেখতে পাওয়া, যেই তাক্বলীদ তাদের মুফতী, আলেম ও ফক্বীহদের মূল পুঁজি। তারা (এই মুক্বাল্লিদগণ) আলেমগণকে দেখতে পায় যে, তারা ইলমুল ইজতিহাদে ব্যস্ত থাকে, আর মুক্বাল্লিদের কাছে ইজতিহাদের জ্ঞান কোন উপকারী জ্ঞান নয়, বরং তাদের নিকটে উপকারী জ্ঞান হচ্ছে যার ফলাফল অত্যন্ত দ্রুত লাভ করা যায় পাঠদান, ফাতাওয়ার বিনিময় গ্রহণ এবং বিচার- ফায়ছালার সিদ্ধান্ত প্রদানের দ্বারা।

এছাড়াও এসব মুক্বাল্লিদদের মধ্য হতে যারা মাসজিদ-মাদরাসা সমূহে তাক্বলীদী বিষয়ের দারস দেওয়ার সুযোগ পায়, অমনি তাদের মজলিসে এসব মুক্বাল্লিদদের মধ্য হতে বৃহৎ একদল সেখানে উপস্থিত হয়, যাদের সংখ্যা কখনো বা শতকের ঘরে আবার কখনো তা শতক পেরিয়ে যায়। যারা তাদের কাছে বিচার-ফায়ছালা ও ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করে। এবং তারাও (এর মাধ্যমে) দুনিয়াবী নেতৃত্ব আশা করে অথবা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অর্জিত নেতৃত্বকে রক্ষা করতে চায়, তাদের পদ মর্যাদা ধরে রাখতে চায় এবং তারা তাদের পূর্ববর্তীরা যার উপরে ছিল তা আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে যত্নবান হয়ে ওঠে।

আর এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা দামী লম্বা কাপড় পরিধান করে। আর তাদের মাথায় উঁচু পাগড়ি পেচিয়ে রাখে। যখন তাদের কোনো সাধারণ মানুষ অথবা প্রশাসনের লোক অথবা তার কোনো সহযোগী এ অবস্থায় এত লোক ভরা মজলিসে, দামী পোষাকে ও মোটা মোটা ভলিয়ম কিতাবসহ দেখে তখন তাদের কোনো সন্দেহ থাকে না যে, এ বৈঠকের শায়খ ও শিক্ষক সবচেয়ে বেশি জানা শোনা মানুষ। সুতরাং দীনের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়ে তার কথাকে গ্রহণ করে। আর সকল সমস্যার সমাধান চায় তার কাছে। আর তার কাছে শরী'আতের বাস্তবায়ন কামনা করে। যা কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান এবং যে সকল বিষয়ের জ্ঞান একজনের থাকা দরকার, সেসব জ্ঞান রাখে এমন কোনো প্রকৃত আলিমের কাছে তারা কামনা করে না।

বিশেষভাবে এসব প্রকৃত জ্ঞানীরা তাদের দুর্বলতা ও ভয় থাকা স্বত্তেও তারা যখন দারসের ব্যবস্থা করে এবং ইলমুল ইজতিহাদ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করে, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কাছে খুব একটা লোকের সমাগম দেখতে পাওয়া যায় না, একান্ত এক, দুই অথবা তিনজন ছাড়া; কেননা ইলমুল ইজতিহাদ এর জ্ঞান অর্জন করবে এমন পর্যায়ের ছাত্র সংখ্যা নিতান্তই অল্প হয়ে থাকে। কেননা কোন ব্যক্তিই (ছাত্র) এ ব্যাপারে ইজতিহাদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না, যদি না তার নিয়ত বিশুদ্ধ হয়ে থাকে, আল্লাহ তা'আলার জন্যই শুধুমাত্র ইলম অর্জনে আগ্রহ থাকে, দুনিয়াবী পদ মর্যাদা হতে বিমুখ থাকে, দুনিয়া বিমুখ হওয়াতে

(যুহদ) আবদ্ধ থাকে এবং মানুষের কাছে কিছু চাওয়া থেকে নিজেকে লাগাম দিতে পারে।

সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি যেন দেখে দুনিয়াদারদের নিকট এই মুহাক্কিক্ব আলিমের স্থান কোথায়। যখন তারা তাকে দেখে মাসজিদের কোনায় বসে থাকতে, তার সামনে মাত্র একজন বা দুইজন ছাত্র বসে থাকে তার তুলনায় যার সামনে মুক্বাল্লিদরা জড়ো হয়ে থাকে। তখন তারা ভাবে যে তারাও একজন মুক্বাল্লিদের ছাত্র অথবা তার থেকেও কম যখন তারা পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করে।

এছাড়াও এইসব মুক্বাল্লিদগণ আহলুত তাক্বলীদ কর্তৃক লিখিত ও তাদের দিকে নিসবত করা বই ও ফাতাওয়া ছাড়া অন্য কিছু তালাশ করে না। (এর মাধ্যমেই মানুষের কাছে) তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর তারা মুজতাহিদ আলিমদের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয় সকল ক্ষেত্রে।

আর যখন কোনো মুজতাহিদ আলিম এমন কোনো ব্যাপারে কথা বলে যা মুক্বাল্লিদদের বিশ্বাসের বিপরীত তখন তার বিরুদ্ধে তার সম্প্রদায়ের সকলে মূর্খের মত দাঁড়িয়ে যায়। আর তাদের (সম্প্রদায়ের লোকের) পক্ষাবলম্বন করে দুনিয়াদার ও প্রশাসনের লোকজন। আর তারা পারলে তার শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি সাধন করে। আর তারা একাজে সাথী হিসেবে পেয়ে যায় তাদের মত মতাবলম্বনকারী জনসাধারণ ও মুক্বাল্লিদদেরকে। কেননা এ কাজে তারা মনে করে দীনের সহযোগিতা করছে। তারা এটাও মনে করে যে, তারা একাজে তাদের অনুসরণকৃত আলিমদের ও তাদের মাযহাবকে রক্ষা করছে। আর এ বিশ্বাস লালন করে তাদের অনুসারীগণও। আর এ সকল কার্যাবলী হয় তাদের নিরেট মূর্খতা, পথভ্রষ্টতা ও তাদের স্বজাতির নিকট থেকে প্রাপ্ত অগাধ প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে।

আর তাই ঐ মুহাক্কিক্ব আলিম যে সঠিক কথা বলে, সে তাদের পক্ষ থেকে আগত বিপদ হতে রক্ষা না পাওয়া এবং তাদের ক্ষতি থেকে রেহাই না পাওয়ার ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী হয়ে ওঠে। আর তার সম্মানের বিষয়টি গালিগালাজ ও বিদ‘আতী, মূর্খ, ভ্রষ্টতার লকবের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

সুতরাং তুমি কাকে পাবে যে তার নিজেকে এই অপ্রিয় পরিস্থিতির সামনে উপস্থাপন করবে এবং মানুষের মধ্যে তারা এই জঘন্য বিষয়টিকে বাত্বিল হিসেবে ঘোষণা করবে, তার সাথে যখন মনের মধ্যে দুনিয়ার প্রভাব, সম্মান ও অর্থ অর্জনের ভালবাসা বিদ্যমান থাকে?

সুতরাং হে নিষ্ঠাবান, ন্যায়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখ, মুজতাহিদ আলিমগণের তাক্বলীদের বিদ'আতকে অস্বীকার করার ব্যাপারে এই চুপ থাকা কি আহলুত তাক্বলীদের সাথে তাদের অপরাধের সাথে একমত হওয়ার কারণে চুপ থাকা? আল্লাহর কসম! তা কখনো। কিন্তু এ বিষয়ে তারা বাহ্যিকভাবে চুপ থাকলেও আল্লাহ তাদেরকে চুপ থাকার কারণে শাস্তি দিবেন এ জন্য তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখেন না। তারা কখনও কখনও এসকল বিষয়ে প্রতিবাদ করেছেন তাদের লিখিত কিতাবের মাধ্যমে। কখনও কখনও তারা অন্যান্য স্পষ্টভাবে তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যারা তাক্বলীদ হারামের ব্যাপারটি তার মৃত্যু পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলেননি।

যেমন: আরতাবী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন তার শায়খ ইমাম ইবনু দাক্বীক্বিল ঈদ থেকে, তিনি তার কাছে একটি কাগজের পৃষ্ঠা চাইলেন ও তাতে কিছু লিখলেন, এ ঘটনাটি ছিল তার মৃত্যুর অসুস্থতার সময়ের। আর তিনি লেখাটিকে তার বিছানার নিচে রেখে দেন। তার মৃত্যুর পরে তারা লেখা কাগজের টুকরাটি বের করে তাতে লেখা দেখতে পেল তাক্বলীদ করা পুরোপুরি হারাম। তাদের মধ্যে আবার অনেকেই রয়েছেন, যারা আহলুল ইলমের মধ্যে যারা তার কাছে বিশ্বস্ত তাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন যা স্তরের পর অন্য স্তরে পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আর যারা পূর্ণভাবে জানে তারা যারা অপূর্ণভাবে জানে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এ বিষয়টি মুক্বাল্লিদদের কাছে গোপন থাকলেও অন্য কারো কাছে গোপন থাকেনি। আমরা আমাদের যুগেও আমাদের শায়খদেরকে দেখেছি যারা ইজতিহাদের জ্ঞানে ব্যস্ত থাকতেন। আমরা তাদের মধ্য থেকে একজনকেও পাইনি যে বলে তাক্বলীদ সঠিক। আর তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মৌলিকভাবে তাক্বলীদকে অপছন্দ করার ব্যাপারটি স্পষ্ট করেছেন। যদিও অনেক মাসআলায় মুক্বাল্লিদগণ বিশ্বাস স্থাপন করে। সুতরাং তার (জ্ঞানী) মাঝে ও তার যুগের মানুষের মাঝে

নানাবিধ সমস্যা ও গণ্ডগোল তৈরী হতে থাকে। আর তাদেরকে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় যাতে তাদের পরিপূর্ণ পুরস্কার নিহিত। আর এরকমই অবস্থা সকল এলাকার সকল যুগের মানুষের।

আর মোট কথা হলো, এটা এমন একটি বিষয় যা প্রত্যেক ব্যক্তিই তার যুগে এটা প্রত্যক্ষ করে। আমরা কখনও শুনিনি যে ইসলামী শহর সমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি শহরের অধিবাসীরা সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে তারা তাক্বলীদ করা ছেড়ে দিয়ে কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণ করবে। এ রকম কাজ এ যুগে তো ঘটেইনি বরং পূর্ববর্তী কোনো যুগেও মাযহাব প্রকাশ হওয়ার পর থেকে এরকম কাজ ঘটেনি। বরং ইসলামী দেশগুলোতে এটা ঘটেছে যে, তারা সকলে মিলে তাক্বলীদকে শক্ত ও মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। তাদের মাঝে যারা নিজেদেরকে আলিম হিসাবে পরিচয় দেয় তারা হয়তবা তাক্বলীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বেশি অবগত। আর তারা এটারই অনুসরণ-অনুকরণ ও প্রচার-প্রচারণা করে। কিন্তু মুহাক্কিক আলিমদের কাছে ঐ ব্যক্তি আহলুল ইলম বা আলেমদের অন্তর্ভুক্ত কেউ নয়। অথবা তারা ইজতিহাদের কিছু জ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যাচাই-বাছাই ও নিরিক্ষণের যোগ্যতা না থাকায় তাক্বলীদের জালেই আটকে থাকে। এটা বাধ্য হয়েই নিজের ইচ্ছায় নয়। আর কতিপয় আলিম আছে যারা ইজতিহাদের সকল জ্ঞানকে ধারণকারী। আর তারাই ঐ সমস্ত লোক যাদের উচিত সত্য-সঠিক কথাকে প্রচার করা আর আল্লাহর সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করা। তবে শরী'আতের কোন কারণ বা ওযর থাকলে ভিন্ন কথা।

আর যারা নিজেকে আলিম হিসেবে পরিচয় দেয় না তারা হয়ত নিরেট মূর্খ, এরা তাক্বলীদ বিষয়ে অথবা অন্য বিষয়েরও তেমন কোন জ্ঞান রাখেনা। তারা নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে দাবি করে এবং তার এলাকার মানুষেরা ছ্বলাত, লেনদেন ও অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে যা করে সেও (তাদের দেখাদেখি) তাই করে। এই ব্যক্তি মূলত নিজেকে দূরে রেখেছে এমন গোড়ামী করা থেকে, যার মধ্যে এসব মুক্বাল্লিদরা লিপ্ত থাকে। আল্লাহ তাদের থেকে আহলুল ইলমদেরকে রক্ষা করুন। এ্ ব্যক্তির মূলত তাক্বলীদের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য নিজস্ব প্রেরণা থাকে না, বরং অধিকাংশ সময় কিছু শয়তান মুক্বাল্লিদ তাদের কাছে যেয়ে কুমন্ত্রণা

দেয় এবং মুজতাহিদ আলিমদের ব্যাপারে নিন্দা করে যা তাকে তাদের (মুজতাহিদ আলিমদের) ব্যাপারে অজ্ঞতার মধ্যে রাখে যাতে তাদের জীবিত অবস্থায় ও তাদের মৃত্যুর পরে প্রভূত ক্ষতি হয়।

আর এক প্রকার লোক আছে যারা এ স্তর থেকে সামান্য ওপরে আছে। এ স্তরের লোকের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে না। তবে ইবাদত ও লেনদেনের ব্যাপারে জ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করে। এদের কিছুটা (সঠিক-ভুল বিষয়ে) পার্থক্য করার জ্ঞান থাকে। তারা যাকে জিজ্ঞেস করে তাকে অনুসরণ করে। যদি তারা মুক্বাল্লিদকে জিজ্ঞেস করে তবে তাকেই অনুসরণ করে। অতঃপর তাক্বলীদের মধ্যে ছাড়া অন্য কোথাও হক্ব বা সত্য আছে বলে তারা মনে করে না। আর যদি মুজতাহিদ আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করে তবে বিশ্বাস করে সত্য হলো সেটিই যে দিকে আলিমগণ পথ দেখিয়েছেন। আর এরপর যে দলে লোক ভারি থাকে সে দলে যোগ দেয়।

এদের মধ্যে আরো এক শ্রেণির মানুষ আছে, যারা মুক্বাল্লিদদের ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকে এবং তা সংরক্ষণ ও বোঝার চেষ্টায় থাকে। আর তা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি তারা মাথা তুলে তাকায় না। আর অন্য কোনো দিকেও তারা লক্ষ করে না। আর বেশির ভাগ সময়ে এদের সীমালঙ্ঘন ও গোড়ামী মুজতাহিদ আলিমদের বিপক্ষেই হয়ে থাকে। তারা তাদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার আক্রমণ চালায় এবং সাধারণ জনগণকে তাদের যার ব্যাপারে মর্যাদা বোঝার ক্ষেত্রে অন্তর সংকীর্ণ হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে ভুল ধারণা দিতে থাকে যে, এরা হচ্ছে মাযহাবের ইমামের বিরোধী। এবং এতে অন্তরসমূহ তাদের সন্মানে ভরপুর হয়ে এমন স্থানে উপনীত হয় যে, পরবর্তীগণ তো দূরের কথা ছাহাবীগণও (তাদের কাছে) এমন মর্যাদার অধিকারী নন। যদিও তারা এটি স্পষ্ট করে এটি বলে না তবু এটিই তাদের অন্তরে গ্রথিত হয়ে থাকে কিন্তু মুখে উল্লেখ করে না।

আর ঐ ইমামের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে যখন মুজতাহিদ আলিমদের কেউ কোনো মাসআলায় তার বিপরীত সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে এই বিরোধিতাকারী (বিদ‘আতী মুক্বাল্লিদ) খুবই নিকৃষ্ট ব্যাপার ঘটিয়ে ফেলে। আর এমন বিষয়ে বিরোধিতা করে যা অকাট্য

দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর এমন ভুল করে বসে যার কাফফারা কোনো জিনিস দ্বারা করা সম্ভব নয়। আর যদিও তাকে কুরআনের আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা দলীল দেওয়া হয়, সে এ দলীল গ্রহণ করে না। সে যেই হোক না কেন, তার ইমামের বিরোধিতা করার জন্য সে তাকে অত্যন্ত জঘন্যভাবে তুচ্ছ মনে করতে থাকে এমনকি যতটা না সে পাপী বা বিভ্রান্ত বিদ'আতী ফিরকাগুলোকে তাচ্ছিল্য করাকে বৈধ মনে করে। তারা তাকে খুবই হিংসা করে। তারা তাকে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের যিম্মিদের থেকেও বেশি ঘৃণা করে। আর তাদের প্রতি এ আচরণ করা ঠিক নয় এমন মন্তব্যকারীকে তারা গবেষণাহীন ব্যক্তি মনে করে।

মোটকথা, সে (মুজতাহিদ আলিম) তাদের (বিদ'আতী মুক্বাল্লিদদের) কাছে নিজে পথভ্রষ্ট ও অন্যকে পথভ্রষ্টকারী। সে নিজে আল্লাহর কিতাব ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে ও ইসলামের আলিমদের অনুসরণ করে এ ছাড়া তার কোনো অপরাধ নেই। এর উপর ভিত্তি করে বলতে চাই, প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হলো সকল আলিমের কথার ওপর আল্লাহর কিতাব ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া সে যে আলিমই হোক না কেন।

أَقْوَال الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة فِي النَّهْي عَن التَّقْلِيد

তাক্বলীদ নিষেধের ব্যাপারে চার ইমামের উক্তিসমূহ

এই চার ইমাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের থেকে বিভিন্ন সূত্রে প্রায় একই অর্থ বর্ণিত হয়েছে। হিদায়াহ্ প্রণেতা 'রউদ্বাতুল 'উলামা' কিতাবের মধ্যে বলেন, আবূ হানিফা রহিমাহুল্লাহ - কে বলা হয়েছিল, যদি আপনি কোনো কথা বলেন আর আল্লাহর কিতাব তার বিপরীত বলে তাহলে আমরা কি করব? তিনি জবাবে বললেন, তোমরা আমার কথাকে পরিহার করে রসূল ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংবাদকে গ্রহণ করবে। তাকে বলা হয়েছিল, আপনার কোনো কথা ছাহাবীর কোনো কথার বিপরীত হলে আমরা কি করব? তিনি বললেন, আমার কথা বাদ দিয়ে তোমরা ছাহাবীর কথা গ্রহণ করবে। তার থেকে এ কথাটি তার অনেক অনুসারী এবং অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন।

নূরুদ্দীন আস-সিনহূরী ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ থেকেও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন, ইবনু মাদীনী তার 'মানসাক' নামক গ্রন্থে বলেন, মা'আন ইবনু ঈসা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মালিক রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমি সঠিক করি ভুলও করি। সুতরাং তোমরা আমার সকল মতামতকে পর্যবেক্ষণ করো, যা কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী হবে তোমরা তা গ্রহণ কর আর যা কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী হবে না তা পরিহার কর। আল-আজহূরী ও আল-খওশ এ কথাটিকে বর্ণনা করেছেন। আর তারা দুই জন মুখতাসারুল খলীল কিতাবের স্বীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। আর মালিক রহিমাহুল্লাহ থেকে তার মাযহাবের অনেক আলিম এবং অন্যরাও বর্ণনা করেছেন।

আর ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ এর থেকে এমন মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে তার মর্যাদা পূর্ণতা হতে মোটেও কম নয়। কারণ এটা তার

থেকে তার বেশিরভাগ ছাত্রই বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও দুই একজন ছাড়া বেশির ভাগ জীবনী লেখকগণও এটা লিপিবদ্ধ করেছেন।

যা ইমাম বায়হাক্বী উল্লেখ করেছেন তার সারকথা হলো, তিনি রবী' পর্যন্ত সানাদ পৌঁছেছেন। তিনি বলেন, আমি শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, এক লোক তাকে কোনো একটি মাসআলাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি এরূপ বলেছেন। তারপর প্রশ্নকারী তাকে বললেন, হে আবূ 'আব্দুল্লাহ! আমরা কি এরূপ বলব? একথা শুনে শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ ভয়ে কেঁপে উঠলেন। আর তার রং পরিবর্তন হয়ে হলুদ বর্ণ ধারন করল। আর তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! কোন জমিন আমাকে বহন করবে, আর কোন আসমান আমাকে ছায়া দিবে? যদি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে কোনো কিছু বর্ণিত হয় আর আমি সেভাবে না বলি। চোখ কান বুজে তো তা মেনে নিতে হবে, হ্যাঁ, চোখ কান বন্ধ করেই তা মেনে নিতে হবে।

শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে ইমাম বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা যদি আমার কিতাবে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের বিপরীত কিছু পাও, তবে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী কথা বলবে আর আমার কথাকে পরিহার করবে।

ইমাম বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ তার থেকে আরো বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যখন কোনো বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী অন্য কোনো বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করে ধারাবাহিকভাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে তাহলে তা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো হাদীছ পরিত্যাগ করবে না, তবে যদি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো হাদীছ তার কোনো হাদীছের বিপরীতে হয় তবে ভিন্ন কথা।

ইমাম বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, তাকে এক ব্যক্তি বললো একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে আমরা কি তা গ্রহণ করবো? তিনি বললেন,

“যখন তুমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো ছ্বহীহ হাদীছ বর্ণনা করবে আর আমি তা গ্রহণ না করব তখন তোমরা সাক্ষী থেক যে আমার জ্ঞান লোপ পেয়েছে।”

ইবনুল ক্বইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ তার ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন কিতাবে বর্ণনা করেন, রবী’ বলেন, আমি ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন। “প্রত্যেক এমন মাসআলাহ যে ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়সাল্লামের কোন ছ্বহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে এবং আমার কথা তার বিপরীত হবে, এমন হলে আমি (অবশ্যই) সেই মত থেকে ফিরে আসব। হোক তা আমার জীবদ্দশায় অথবা আমার মৃত্যুর পরে।”

হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া বলেন, শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিপরীত কোনো কথা বলিনি। আর যদি ছ্বহীহ ভাবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো কথা আমার কথার বিপরীত প্রমাণিত হয়, তবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাই অগ্রগামী হবে, সেক্ষেত্রে আমার তাক্বলীদ করবে না।

আর হুমায়দী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো একজন লোক ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ কে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে ফাতাওয়া দিলেন। আর বললেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে এভাবে বলেছেন। তখন লোকটি বললো, হে আবূ আব্দুল্লাহ! আপনিও কি এভাবে বলছেন? তখন ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ তাকে বলেন, তুমি কি দেখেছ যে, আমার কোমরে বন্ধনী রয়েছে? আর তুমি কি দেখছ যে, আমি গির্জা থেকে বের হয়েছি? আমি বলছি আল্লাহর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তুমি বলছো আপনিও কি এমন বলছেন? আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করছি, আমি নিজের কথা বলছি না। ইমামুল হারামাইন তার নিহায়াহ্ কিতাবে ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার মাযহাবের বিপরীত কোনো ছ্বহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে তোমরা তার অনুসরণ কর, আর জেনে রাখ যে, সেটাই হলো আমরা মাযহাব। তার মত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন খত্বীব বাগদাদী। অনুরূপভাবে ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহও

তার তারিখুল ইসলাম ও সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যার সংখ্যা অগণিত।

হাফিয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ 'তাওয়ালিৎ তা'সীস' গ্রন্থে বলেন, ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে,

إذا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مذهبي

"কোনো হাদীছ ছুহীহ প্রমাণিত হলে সেটাই আমার মাযহাব।"

আর তিনি সুবকী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ মাসআলায় তার একটি কিতাব লেখা আছে।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ চার ইমামের মধ্যে নিজস্ব রায় প্রদান করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতেন। আর তা থেকে সবার চেয়ে অধিক দূরে থাকতেন। আর সুন্নাতকে বেশি আঁকড়ে ধরে থাকতেন। তার থেকে ইবনুল ক্বইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ ই'লামুল মুওয়াক্বিঈন কিতাবে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যাতে স্পষ্ট ভাষায় আছে, "রায় বা মতামতের উপর মৌলিকভাবেই কোন আমল নেই।" অনুরূপভাবে তার থেকে ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ ও তার ছাত্রদের মধ্যে থেকে অনেকেই বর্ণনা করেছেন। আর যদি রায় বা মতামত নিয়ে তারা মতভেদ করত, তবে তিনি তা থেকে সরে পড়তেন। তিনিও বাকী তিন ইমামের মত হাদীছ অনুপাতে কথা বলতেন। আর বলতেন ছুহীহ হাদীছই তাদের মাযহাব। বরং তিনি তাদের চেয়ে এ ব্যাপারে বেশি সচেতন ছিলেন। কারণ তারা যে রায় বা নিজস্ব মতামত কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীতে যায় না তা মেনে নিতেন। কিন্তু তিনি মৌলিকভাবেই তা থেকে নিষেধ করেছেন। আর ইমাম শা'রানী রহিমাহুল্লাহ আল-মীযান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, চার ইমামের প্রত্যেকেই বলেছেন,

إذا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مَذْهَبنَا

"হাদীছ ছুহীহ প্রমাণিত হলে সেটাই আমাদের মাযহাব।"

আর তাদের কারো কোনো ক্বিয়াস বা কোনো যুক্তি ছিল না।

কুরআন ও হাদীছকে প্রাধান্য দেওয়ার উপর চার ইমাম ইজমা’ বা একমত হয়েছেন। যখন তুমি নিশ্চিত হলে যে নিজেদের মতের ওপর কুরআন ও হাদীছকে প্রাধান্য দেওয়ার উপর চার মাযহাবের ইমামগণ ইজমা’ বা একমত হয়েছেন, সুতরাং তুমি বুঝতে পেরেছ, যে আলিম কুরআন ও সুন্নাতের ওপর আমল করে আর মাযহাব সমূহের ইমামদের কথাকে পরিহার করে, সে (আলিম) মাযহাব সমূহের ইমামদের কথা অনুযায়ী কাজ করে। আর মুক্বাল্লিদ হলো সেই ব্যক্তি যে তাদের কথা সমূহকে প্রাধান্য দেয়।

মূলত সে (মুক্বাল্লিদ) আল্লাহ, তার রসূল ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর, তার মাযহাবের ইমামের এবং ইসলামের সকল আলিমদেরই বিরোধিতা করলো।
আমার জীবনের কসম! আল্লাহর ভয়ে এবং আল্লাহর রসূল ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে লজ্জা পাওয়ার ভয়ে এ সকল বর্ণনাগুলো আমি লিখে চলেছি। হায় আল্লাহ! কি আশ্চর্য ব্যাপার! কোন মুসলিমের কী আল্লাহ ও তার রসূল ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে কোন আলিমের কথার উপর প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে এসব বর্ণনা উল্লেখ করে তা শক্তিশালী করার প্রয়োজন হতে পারে? হায় আল্লাহ! কী আজব কথা! কোন সে মুসলিম যার কাছে এ বিষয়টি অস্পষ্ট হওয়ার কারণে তাকে এসকল ইমামদের (রহিমাহুমুল্লাহ) কথা উল্লেখের দরকার পড়ে যে আল্লাহ ও তার রসূল ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা তাদের কথার উপরে প্রাধান্য পাবে? কেননা তারজীহ প্রদানের বিষয়টি তো পরস্পরের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। আর কে সেই ব্যক্তি, যার কথা আল্লাহ ও তার রসূল ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বিরোধী হবে আর আমরা সেখানে অগ্রগণ্য বা প্রাধান্য পাওয়ার দিক নিয়ে আলোচনা করব? সুবহানাল্লাহ [আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষনা করছি]! এটা তো মহা অপবাদ। আল্লাহ কখনো তাদের কল্যাণের ফায়ছালা করবেন না, যেসব মুক্বাল্লিদরা এই চার ইমামদেরকে স্পষ্ট করে একথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করেছেন যে, আল্লাহ ও তার রসূল ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা তাদের কথার উপরে প্রাধান্য পাবে। আর এটি ঘটেছে তখন, যখন

তারা প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তারা (মুক্বাল্লিদরা) ইয়াহূদী-নাসারাদের আহবার-রুহবান (ধর্মীয় গুরুদের) এর ন্যায় তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছে।

আর এরাই সেসব লোক যারা আমাদেরকেও বাধ্য করেছে এ সকল কথাগুলোকে এখানে উল্লেখ করতে। নতুবা বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। কারো কাছেই তা অস্পষ্ট নয়। যদিও আমরা মেনে নিই যে, (আল্লাহর কাছে পানাহ চাই) ইসলামের আলিমদের মধ্যে কেউ একজন তার কথাকে আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার সমান বলে উপস্থাপন করে থাকে, তাহলে তো সে সাথে সাথেই কাফির ও মুরতাদে পরিণত হবে। তার কথা আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার উপর অগ্রগামী হওয়া তো দূরের কথা। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজি'ঊন।

এসকল মাযহাবসমূহ তাদের অনুসারীদেরকে কী অবস্থার সৃষ্টি করেছে আর কোথায় তাদেরকে বের করে নিয়ে গিয়েছে? ইস! এসব নিরেট গণ্ডমূর্খ মুক্বাল্লিদরা জ্ঞানের দিক থেকে বঞ্চিত হওয়া স্বত্বেও যদি একটু বিবেকের দৃষ্টিতে চিন্তা করে দেখত! (তাহলেও বুঝতে পারত) তারা তাদের মাযহাবের ইমামগণকে রসূল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান করে ফেলেছে এবং ধারণা করেছে যে তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাড়াবে। এসমস্ত মুক্বাল্লিদগণের মধ্যে যদি কারো বিন্দুমাত্র বিবেকও অবশিষ্ট থাকে তার অন্তরেও কী এটা উপলব্ধি হবে না যে, এই সমস্ত অনুসৃত ইমামগণ যদি আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাড়ায়, তবে তারা কী তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করবে? নাকি তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করবে তাদের মতামতের দ্বারা? আর এটা তো কখনোই হতে পারে না। বরং ঐ ইমামগণ আল্লাহকে ভয় করেন এবং তার ব্যাপারে অধিক সচেতন।

কেননা অনেক বড় বড় ছাহাবী অনেক নতুন বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে ছেড়ে দিতেন তার সম্মানার্থে ও ব্যক্তিত্বের কারণে। আর তাদের কাছে এটা ভালো মনে হতো যে কোনো জ্ঞানী গ্রাম্য ব্যক্তি এসে নাবী

ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করবে, আর তার প্রশ্ন করার কারণে তারা উপকৃত হবেন। যেমনটা ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। আর তারা তার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। তারা তাদের সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল কিন্তু সম্মান ও মর্যাদার কারণে তারা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে তাকাচ্ছিল না। তারা তাদের নিজেদের মতকে রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোকাবিলায় খুবই নগন্য মনে করতো। আর তাবিঈগণও ছাহাবীদের সাথে প্রায় এমন আদবই রক্ষা করে চলতেন। আবার অনুরূপভাবে তাবি‘ তাবিঈনও তাবিঈদের সাথে এমন আদব রক্ষা করে চলতেন যেমন তাবিঈগণ ছাহাবীদের সাথে করতেন।

সুতরাং হে মুক্বাল্লিদ! রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে যদি তোমার ইমাম উপস্থিত হতেন তাহলে ব্যাপারে তোমার ধারনা কী?

সুতরাং হে মিসকীন! যখন ইলমের হিদায়াতের রাস্তা তোমার ছুটে গেছে তখন আকলের হিদায়াতের রাস্তা যেন না ছুটে যায়। কারণ যখন তুমি তার (বিবেকের) আলোয় এক্ষেত্রে আলোকিত হতে চাইবে তখন তুমি তোমার অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে সত্যের আলোয় বের হয়ে আসতে পারবে।

সুতরাং যখন চার ইমামের মাযহাব থেকে আমরা যা উল্লেখ করেছি যে- তাদের মতামতের ওপর কুরআন ও সুন্নাতের দলীল প্রাধান্য পাবে (আর এটা তুমি বুঝতে পেরেছ)। আর সেই সাথে আমরা তোমার জন্য আরো পেশ করছি তাদের নিকট হতে তাক্বলীদ নিষেধের ব্যাপারে ইজমা’র বর্ণনা। আর আমরা তোমাকে আরো বর্ণনা করছি ইমাম আবূ হানিফা রহিমাহুল্লাহ এর উক্তি। আরো বর্ণনা করছি মদীনার ইমাম মালিক বিন আনাস রহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে যা বলেছেন। আর তোমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে একটু আগে তাক্বলীদ নিষেধের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন। মুযানী তার ‘আল-মুখতাসার’ কিতাবের শুরুতে বলেছেন, যা এরকম: আমি ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ এর ইলম থেকে এটাকে সংক্ষিপ্ত করেছি, যেন যে ব্যক্তি চায় তাকে আমি পড়িয়ে জানাতে পারি যে, তিনিও তার তাক্বলীদ ও অন্যের তাক্বলীদ করা থেকে নিষেধ করেছেন। তাক্বলীদ করার আগে সে যেন তার

দীনের প্রতি লক্ষ্য রাখে আর নিজের ব্যাপারে সতর্ক হয়। সুতরাং তুমি এই ব্যক্তির (মুযানী) প্রতি লক্ষ্য কর যিনি শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ এর মাযহাবের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি তার ও অন্যের তাক্বলীদ নিষিদ্ধের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

আর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ এর থেকে তাক্বলীদ নিষিদ্ধের ব্যাপারে অনেক কথা বিদ্যমান আছে। আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ কে বললাম, আমি কি ইমাম আওযাঈ রহিমাহুল্লাহ ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ থেকে অধিকতর অনুসৃত। উত্তরে তিনি বললেন, দীনের ব্যাপারে তুমি তাদের কারোর তাক্বলীদ করো না। এ ব্যাপারে যা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ও তার ছাহাবীদের থেকে এসেছে তা গ্রহণ কর। ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ আমি তাকে অর্থাৎ আহমাদ ইবনু হাম্বালকে বলতে শুনেছি, ইত্তিবা (অনুসরণ) হচ্ছে কোন ব্যক্তি কর্তৃক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীদের থেকে আগত বিষয়কে গ্রহণ করা এবং এরপরে যারা তাদের অনুসারী উত্তম কাজে তাদের অনুসরণ করা। সুতরাং তুমি লক্ষ্য কর তিনি (ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ) কিভাবে তাক্বলীদ ও ইত্তিবা' এর মাঝে পার্থক্য করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমাকে ইমাম আহমাদ বলেন, তুমি আমার তাক্বলীদ করো না, ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ এর তাক্বলীদ করো না, ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ, ইমাম আওযায়ী রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম সাওরি রহিমাহুল্লাহ প্রমুখেরও তাক্বলীদ করো না। আর তুমি গ্রহণ কর সেই উৎস থেকে যেখান থেকে তারা গ্রহণ করেছে। তিনি আরো বলেন, কোনো ব্যক্তির বুঝের স্বল্পতা হলো তার দীনের ব্যাপারে কোনো মানুষের তাক্বলীদ করা।

ইবনুল ক্বইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আর এ কারণেই ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ফিক্বহের কোনো কিতাব রচনা করেননি। তার মাযহাবের ছাত্ররাই তার কথা, কাজ ও প্রশ্নের উত্তর প্রভৃতি সংকলন করেছেন।

'তালবীসে ইবলীস' কিতাবে ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি জানি মুক্বাল্লিদ যে বিষয়ে তাক্বলীদ করে তাতে সে বিশ্বস্ত নয়। আর

তাক্বলীদের মাঝে বিবেকের উপকারীতাকে বাতিল করা হয়। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

মোটকথা তাক্বলীদ নিষিদ্ধের ব্যাপারে মাযহাবী চার ইমামের অনেক দলীল বিদ্যমান রয়েছে। আরো দলীল আছে তাদের ও অন্যদের ব্যক্তি মতামতের ওপর কুরআন ও সুন্নাতের দলীলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে। তাদের ও অন্যান্যদের অনুসারীদের কারো কাছেই এটা অস্পষ্ট নয়। আর অনুসরণীয় সকল ইমামগণও একথার উপরেই ছিলেন।

القَوْل بِإنسداد بَاب الِاجْتِهاد بِدعَة شَنيعة

‘ইজতিহাদের দরজা বন্ধ’ এমন কথা বলা জঘন্য বিদ‘আত

মুক্বাল্লিদরা নিজেদের ওপর অন্যের তাক্বলীদ করাকে ওয়াজিব করে নিয়েছে। আর তারা এটা ভেবে প্রশান্তিতে আছে যে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর তারা সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেয় যারা জানা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের সাথে মিল রাখে। আর তারা তাদেরকে তাক্বলীদের মাসআলা জানানোর জন্য কিতাব লেখে। কারণ কোনো একটা মাযহাবের অনুসরণ করার পর আর তাদের ইমামদের মানার পরে আর কোনো ইজতিহাদ করা যাবে না। তারা তাদের বিদ‘আতের সাথে অন্য নতুন বিদ‘আত সংযুক্ত করে, তাদের নিকৃষ্ট কাজের সাথে অন্য নিকৃষ্ট কাজ মিলায়। আর তারা তাদের নিজেদের উপর মূর্খতাকে নির্দিষ্ট করে নেয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলার দুঃসাহসিকতা দেখায় যে, আল্লাহ তার বান্দাদেরকে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে অক্ষম হয়ে গেছেন, সে বান্দাদের ব্যাপারে বাতিল হুকুম প্রদানে কোন প্রকার পিছপা হবে না।

আল্লাহ! কি আশ্চর্যের কথা! এ সমস্ত জ্ঞান পাপী মূর্খরা তারা যে তাক্বলীদের বিদ‘আতের উপরে আছে তা নিয়ে কখনো পরিতৃপ্ত হয়নি। তারা যে তাক্বলীদের বিদ‘আত করে তা হলো সকল বিদ’আতের মূল এবং সকল নিকৃষ্ট কাজের মূল। বরং এরা এই তাক্বলীদের মাধ্যমে উম্মাতে মুহাম্মাদী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর কিতাব ও তার রসূলের (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহ থেকে শরী‘আত জানার পথ বন্ধ করে দেয় আর সেখানে আর কোন পথ বা উপায় থাকে না।

এমনকি মানুষের বুদ্ধি যেন পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর মানুষের বিবেকও যেন দূর হয়ে গেছে। এগুলোর প্রতিটি বিষয়ই এসব মুক্বাল্লিদদের

আকাঙ্খিত যেন তাক্বলীদের বিদ‘আত উম্মাতের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করে এবং আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যেন (মূর্খতার কারণে) তার নিম্নস্তর থেকে উপরে উঠতে না পারে। যেন এই যে আল্লাহর কিতাব ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের শরী‘আত আমাদের সামনে আছে তা মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। আর রহিতকারী হলো তারা আল্লাহর দীনের মধ্যে তাক্বলীদের যে বিদ‘আত চালু করেছে। সুতরাং মানুষ কুরআন ও সুন্নাতের মাঝে যা আছে তা আমল করবে না। বরং তাদের মাযহাব যা নির্ধারণ করেছে তা ছাড়া অন্য কিছুই তাদের শরী’আত নয়। আল্লাহ তা দূর করে দিন (মুসলিম সমাজ থেকে)। কুরআন ও সুন্নাতের মধ্যে যা আছে তার সাথে যদি তা (মাযহাব) মিলে যায় তবে ভালো কথা। তাহলে মাযহাবের উপরেই আমল হবে, যা মিলে গেল তার উপরে নয়। আর যদি তা কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধী হয় অথবা যে কোনো একটির বিরোধী হয় তবে তার (উক্ত আয়াত বা হাদীছ) ওপর আমল করা যাবে না। তা আঁকড়ে ধরাও বৈধ হবে না। এটিই তাদের কথা, কবিতা ও রচনার মূলকথা।

কিন্তু তারা দেখেছে যে, এই জাতীয় কথা স্পষ্টভাবে বলা বিশেষ শ্রেণি তো পরের কথা, সাধারণ শ্রেণির মানুষের অন্তরও তা অপছন্দ করে। (এটা শুনলে) তাদের লোমসমূহ শিউরে ওঠে এবং তাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয়। তাই তারা এই সরাসরি কুফুরী কথাকে একটু পরিবর্তন করে এর সমমাত্রিক কথাবার্তা বলে থাকে, যার উদ্দেশ্য ও লাভ একই হয়ে থাকে। কিন্তু এটা সাধারণ মানুষের জন্য একটি নিফাক্বী হিসেবে কাজ করে। (আর তা এভাবে যে) তারা বলে, ইজতিহাদের দরজা তো বন্ধ হয়ে গেছে।

এই (ইজতিহাদের দরজা) বন্ধ হওয়ার বানোয়াট কথা ও নিকৃষ্ট অপবাদের অর্থ হচ্ছে এই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন কেউ নেই যে আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে বুঝতে পারবে। অনুরূপভাবে কিতাব ও সুন্নাহর কাছে যাওয়ার কোন পথও নেই। আর যখন সেখানে যাওয়ার পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে থাকা হুকুমের উপর ও আমল করা যাবে না তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করাও যাবে না। হোক তা মাযহাবের সাথে মিলে যাক অথবা না যাক। কেননা কেউ তো বাকী নেই, যে এটা বুঝবে এবং অর্থ জানবে আর এটা যুগ যুগ পর্যন্ত

এমনই থাকবে। এসব মুক্বাল্লিদরা এভাবে করে আল্লাহর উপরে মিথ্যাচার করেছে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ব্যাপারে দাবি করেছে যে, তার জন্য সম্ভব নয় যে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা তাদের জন্য প্রণীত শরী'আত ও ইবাদাতগুলো বুঝতে পারে।

এমনকি তিনি তার কিতাব ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবানীতে যে শরী'আত তাদেরকে দিয়েছেন তা শর্তহীন শরী'আত নয়। বরং তিনি তাদেরকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত একটি শর্তযুক্ত শরী'আত দিয়েছেন। আর তার মেয়াদ হলো এ মাযহাব প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত। আর তা প্রকাশ হওয়ার পর না কুরআন আর না সুন্নাতের প্রয়োজন আছে। বরং এ উম্মতের জন্য একটা নতুন শরী'আত চালু হয়েছে। আর তাদের জন্য একটা নতুন দীন আবিষ্কৃত হয়েছে। আর তাদের মন যা চায় সেভাবে তারা রহিত করেছে। আর তাদের ধারণা অনুযায়ী তারা কুরআন ও সুন্নাতের ওপর যা ইচ্ছা তা প্রাধান্য দিয়েছে। আর এ বাস্তব সত্য কথা তারা মুখে অস্বীকার করলেও এটা তাদের জন্য আবশ্যক, এটা এড়িয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। এটা স্বীকার করা থেকে পালিয়ে বাঁচার তাদের কোনো পথ নেই। ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে একথা দ্বারা তাদের এটা ছাড়া কি উদ্দেশ্য হতে পারে যে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে তাক্বলীদের দরজা খুলে দিয়েছে। যদি তারা এটা স্বীকার করে তবে যা আমরা উল্লেখ করেছি তা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আর আমরা তখন তাদের বিপক্ষে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে দিব। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

"আর তারা তাদের ধর্মীয় গুরু ও পাদ্রীদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে।" [সূরা আত-তাওবাহ; ৯:৩১]

আর তারা যদি একথাকে অস্বীকার করে আর বলে ইজতিহাদের দরজা খোলা আছে। আর তাক্বলীদকে আঁকড়ে ধরে থাকা ফরয নয়। তাহলে [তাদেরকে বল] হে বোকা সকল! যারা কুরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে, এবং সেখান থেকেই তাদের দীন গ্রহণ করে থাকে তাদের প্রতি

তোমরা কেন সব ধরণের ইট পাথর নিক্ষেপ করে থাক, কেনই বা তোমরা তাদের সম্মান নষ্ট করা ও আশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের উপরে ঝাপিয়ে পড়াকে বৈধ জ্ঞান করে থাক? তারা এটা জানে, আর তারা কোন বিষয়ের উপরে রয়েছে যারা এসকল বিষয় অবগত তারাও জানে যে, তারা ইজতিহাদের দরজা এবং কুরআন-সুন্নাহ জানার সকল পথকে বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং আমরা যা উল্লেখ করেছি তা নিঃসন্দেহে তাদের জন্য দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেওয়া আবশ্যক।

হে ন্যায়বিচারক! তুমি খেয়াল কর তাক্বলীদের এ বিদ'আতের কারণে দীনের মধ্যে কি নতুন নতুন (সমস্যা) ও শয়তানী গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কেননা তাদের এ কথার কারণে বিশেষভাবে অর্থাৎ ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যদিও তাক্বলীদ ছাড়া তাক্বলীদের অন্য কোন ক্ষতি নাও থাকত, তবু সেটাই যথেষ্ট ও চূড়ান্ত ক্ষতি বলে বিবেচিত হত। কারণ তাক্বলীদ এমন এক বিদ'আত যা শরী'আতকে তার কাঠামো সমেত উঠিয়ে দিয়েছে, আল্লাহর কালাম ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাকে রহিত করে দিয়েছে, তাদের উপরে অন্যদের কথাকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং অন্য বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। কবির ভাষায়

"হে ইসলামে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণাকারী দাঁড়িয়ে তার মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা কর... ভালো কাজ দূর হয়ে গেছে আর মন্দ কাজ শুরু হয়েছে।"

আর বর্তমান যুগে আমরা তাদের মধ্য থেকে পেয়েছি এমন কতক লোককে যে তাদের চেয়েও বেশী মাযহাবী গোড়ামী করে। আর তারা যখন শোনে কোনো লোক ইজতিহাদ করছে, আর সে কুরআন ও রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত থেকে তার দীন গ্রহণ করছে। তখন তারা তার বিরোধিতায় এমন ভাবে লেগে যায় যে, তা দেখে ইসলামের চোখ কেঁদে ফেলে। তারা তার থেকে যা বৈধ করে, একজন জিম্মির থেকে তা বৈধ করে না। তারা তাকে আঘাত করে, অভিশাপ দেয়, ফাসিক্ব বা পাপী বান্দা বলে গাল মন্দ করে, তার বাড়ির ওপর আক্রমণ করে ও পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করে। (এ কাজের মাধ্যমে তারা) আত্মপ্রকাশ করে,

তার সম্মান হানি করে, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ! যদি না তাদের উপর খিলাফাতের চাবুকের ভয় থাকত - আল্লাহ খিলাফাতের রুকনগুলোকে শক্তিশালী করুন এবং তার সুলতানের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করুন - তাহলে তারা প্রতিশোধ স্বরূপ কুরআন ও সুন্নাতের আলিমদের রক্তকে প্রভাহিত করাকে বৈধ করে নিত। আর তাদের সাথে এমন আচরণ করত যেমন আচরণ তারা যিম্মিদের সাথেও করে না।

আর এ বিষয়টি আমরা দেখেছি যা এখানে বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদের চেয়ে তাদের এ পর্যায়ে পৌঁছানোর কারণ হলো, এক দল শয়তান মুক্বাল্লিদ ছাত্র দীনের জ্ঞানের বিনিময়ে দুনিয়ার লাভ অর্জন করেছে।

আর যখন তাদের থেকে মূর্খগণ এসকল কথা শোনে তখন এটা তাদের মাথায় খুব ভালো ভাবে ঢুকে যায়। কারণ তাদের কাছে এসকল মুক্বাল্লিদ আলিমগণ তাদের বেশ ভূষনে খুব সুন্দর দেখতে হয়। তাদের মাজলিসে অনেক মানুষের সমাগম ঘটে। তারা বিভিন্ন ফাতাওয়া ও বিচার মিমাংসা করে ইত্যাদি কারণে বড় আলিম বলে বিবেচিত হয়, যেমনটা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

সুতরাং একথাগুলো যে সত্য এতে ঐ ব্যক্তি কোন সন্দেহ করে না। সে এ ব্যাপারেও সন্দেহ করে না যে, ঐ কুরআন ও সুন্নাতের উপর 'আমলকারী 'আলিমকে সে ('আলী রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু ও তার বংশধরদের) শত্রু মনে করে। সুতরাং ঐ মূর্খ সাধারণ মানুষটি তার জাহিলী উত্তেজনায় তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, যে উত্তেজনা দীনের ব্যাপারে একটি বিভ্রান্তি থেকে প্রকাশিত। আর এই ঐ মূর্খ ব্যক্তিকে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করে তারা (মুক্বাল্লিদ) যাদের কথা আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি, এটা তাদের (তাক্বলীদের) বিদ'আতকে রেওয়াজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ও তাদের চেয়ে যারা আরো মূর্খ তাদের কাছে এদের অজ্ঞতা ও কমতিকে গোপন করার লক্ষে। আর এই মুক্বাল্লিদরা সাধারণ মানুষকে এসব সূক্ষ ইবলিসী কারিসাজিতে ভুল বুঝিয়ে থাকে, কেননা তারা জানে যে, এসব সাধারণ মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ঠ্য হচ্ছে তারা প্ররোচনার আঙ্গিকেই গড়ে ওঠে এবং সীমা ছাড়িয়ে যায়।

সুতরাং এই শয়তানী উপায়ে ও ইবলীসী ষড়যন্ত্রের কারণে মুজতাহিদ আলিমগণ জনসাধারণের দ্বারা ইয়েমেন ভূখণ্ডে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। এসব পাপের সব দায় শয়তান মুক্বাল্লিদগণের। কেননা তারা হচ্ছে (গোপন) কঠিন রোগ ও প্রাণ-ঘাতক বিষ।

যদি জনসাধারণের বিবেক থাকতো তবে তাদের কাছে এসব শয়তান মুক্বাল্লিদদের চক্রান্তের অসারতা গোপন থাকতো না। কেননা যে তার ইবাদত ও লেনদেনে কুরআন ও সুন্নাতের দলীলের অনুসরণ করে, (তার ব্যাপারে) যার বিবেক বুদ্ধি রয়েছে এমন কেউ কি ধারণা করতে পারে যে এটা (হিদায়াত) থেকে বিচ্যুতিকে আবশ্যক করে? এই ব্যক্তি বিবেক থেকে কোথায় অবস্থান করছে? জনসাধারণ ‘ইলম হারানোর পাশাপাশি ‘আক্বল বা বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলেছে। বিশেষকরে দীনের ও শয়তানের সংশয়ের ক্ষেত্রে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজি‘ঊন।

সেসব জনসাধারণের কি হবে যারা ‘ইলমের আলো হারিয়ে ফেলে তাদের অন্তরকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! আর তারা ‘আলিমদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে! আর তাদের বিরুদ্ধে হুকুম আরোপ করে । এটা প্রসিদ্ধ যে সকল যুগে সাধারণ মানুষরা আলিমদের সম্মানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে এমন এক পর্যায় পর্যন্ত যা বর্ণনাতীত। কখনও কখনও তারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে ভিড় করত। তাদের হাতে কপালে চুমা দিত। তাদের কাছে আসলে দু’আ কবূল হবে এ উদ্দেশ্যে তাদের কাছে দু’আ নিতে আসত। আর তারা স্বীকার করত যে তারা তার দেশে বান্দাদের জন্য আল্লাহর কাছে দলীল স্বরূপ। তারা তাদেরকে যা নির্দেশ দিত তা পালন করার মাধ্যমে তাদের আনুগত্য করত। আর জান-মাল তাদের সামনে বিলিয়ে দিত। এবং অবশ্যই তারা তাদেরকে কোনো পাপের কাজে উদ্বুদ্ধ করত না, আর এসকল গোমরাহী শয়তানী ও চারজনের তাক্বলীদের ইবলীসী জাহিলিয়াতও ছিল না। যার বর্ণনা আমরা আগেই করে এসেছি।

তুমি লক্ষ করে দেখ, ইয়ামেনের মুক্বাল্লিদদের থেকে প্রকাশিত এসব কর্মকাণ্ড কি এমন লোকদের থেকে প্রকাশিত হয়েছে যারা স্বীকৃতি দেয় যে, ইজতিহাদের দরজা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত খোলা আছে এবং কোন মুজতাহিদের

জন্য - যে ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত হয়েছে - তাক্বলীদ করা জায়েয নেই ও সেই সাথে আলিমের জন্য তার ইজতিহাদের ক্ষমতা অর্জনের পরে তার নিজের ইজতিহাদের দিকে ফিরে আসা আবশ্যক যদিও তা একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়ে অথবা একটি মাসআলাতেই হোক না কেন -যেমনটি ইমামগণের ফিক্বহের কিতাব রচনাকারীগণ স্পষ্ট করে বলেছেন এবং মৌলিক ও প্রশাখাগত কিতাবসমূহেও তা লিপিবদ্ধ করেছেন?

কখনও নয়, আল্লাহর কসম! বরং এটা এমন ব্যক্তির কাজ যে আল্লাহর কিতাব ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতকে অনুসন্ধানকারী ও তাতে উৎসাহিত ব্যক্তিদের সাথে শত্রুতা করে। এবং ইজতিহাদকে নিষেধ করে আর তাক্বলীদকে ওয়াজিব করে। এবং সে শরী'আত ও শরী'আত বিশেষজ্ঞদের মাঝে নেমে আসে আর সেখানে তাদের উপরে জানা ও বোঝার পথকে পরিবর্তন করে দেয়। যেমনটি অন্যান্য সকল মাযহাবের মুক্বাল্লিদগণ করে থাকে। বরং তারা তার চেয়ে বেশি করে তা হলো- বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামী যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এটা ছাড়াও, ইমামগণ তাদের উসূলী ও ফুরুঈ (মৌলিক ও প্রশাখাগত) কিতাবসমূহে স্পষ্টভাবে ইজতিহাদের ইলমসমূহের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। যা মোট পাঁচটি। যা প্রতিটি সংক্ষিপ্ত বিষয়ের মধ্যে ইজতিহাদের জন্য যথেষ্ট। এসব মুক্বাল্লিদরা জানে যে বর্তমান যুগের কুরআন ও সুন্নাহ জানা অসংখ্য আলিম রয়েছেন যারা ঐ পাঁচটি বিষয়ের প্রতিটি বিষয়ই জানে এবং পরিমিত মাত্রার চেয়েও তাদের জ্ঞান বহুগুণে বেশী রয়েছে, তারা এ পাঁচটি ছাড়াও আরো অসংখ্য বিষয়ের ইলম রাখে।

তারা কোনো কিছু না জেনে মূর্খ হলেও জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করে তাদের (আলিমদের) জ্ঞানের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারে, যার ফলে তারা উপকৃত হয়। আর এর মাধ্যমেই তুমি জানতে পারবে যে, মুক্বাল্লিদ ব্যক্তিকে এ পথে শুধুমাত্র সে যার তাক্বলীদ করে, তার প্রতি গোড়ামীই পরিচালিত করে থাকে। সে তার সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে তার মতকে প্রতিষ্ঠা করতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় যা বর্ণনাতীত, তার কাছে সম্মানের এই পর্যায়টি ছাহাবীদের জন্য থাকে না এমনকি আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার জন্যও নয়।

إِبْطَال التَّقْلِيد
তাক্বলীদকে বাতিলকরণ

ইমাম বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম ইবনুল বার রহিমাহুল্লাহ হুযায়ফাহ্ ইবনুল ইয়ামান রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন:

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্ম জাযক ও পাদ্রীদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে।"[সূরা আত তাওবা ৯:৩১]

এ আয়াত সম্পর্কে রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তারা কি তাদের (ইয়াহূদী বিদ্বান ও নাসারাদের পাদ্রী) ‘ইবাদত করত? তখন তিনি উত্তরে বললেন, না। তবে তারা তাদেরকে হারাম বিষয় হালাল করলে কি তারা তা হালাল হিসাবেই গ্রহণ করত না? আর তারা কোনো হারাম বিষয়কে তাদের জন্য হালাল করলে তারা কি সেটাকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করত না? সুতরাং তারা এ হিসাবে তাদের রব হয়ে গেছে। আর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইবনু আবি হাতিমের হাদীছ থেকে মারফূ’ সূত্রে, যেমনটি ইমাম বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন। আর এ তাফসীরের মত তাফসীর নিয়ে এসেছেন ইবনু ‘আব্দুল বার রহিমাহুল্লাহ কতিপয় ছাহাবী থেকে মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সানাদে।

সেখানে তিনি বলেছেন, যদি তারা তাদেরকে ‘ইবাদত করার কথা বলত তবে তারা তাদের কথা শুনতো না। সুতরাং তারা আদেশ দিল আর আল্লাহর হালাল বিষয়কে হারাম ও হারাম বিষয়কে হালাল করে দিল, তারাও তা মেনে নিল। এভাবেই তারা রব হিসেবে পরিগণিত হল। এব্যাপারে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ ٢٣ ۞ قَٰلَ أَوَلَوۡ جِئۡتُكُم بِأَهۡدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمۡ عَلَيۡهِ ءَابَآءَكُمۡۖ﴾

"আর এভাবেই আপনার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই আমরা কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি তখনই তার বিলাসপ্রিয়রা বলেছে, ‘নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শে পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে থাকব।’ সে সতর্ককারী বলেছে, ‘তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পথ নিয়ে আসি তবুও কি (তোমরা তাদের অনুসরণ করবে)?’" [সূরা আয্ যুখরুফ - আয়াত ২৩-২৪]

সুতরাং তারা তাদের বাপ-দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলেছে,

﴿إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ﴾

‘নিশ্চয় তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তার ব্যাপারে অস্বীকারকারী।’[সূরা যুখরুফ - আয়াত ২৪] মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَ وَتَقَطَّعَتۡ بِهِمُ ٱلۡأَسۡبَابُ ١٦٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةٗ فَنَتَبَرَّأَ مِنۡهُمۡ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعۡمَٰلَهُمۡ حَسَرَٰتٍ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ﴾

‘যখন যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা, যারা অনুসরণ করেছে তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবে এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে। আর তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, ‘হায়! যদি একবার আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো তবে আমরাও তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা

আমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী তদেরকে দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ। আর তারা কখনো আগুন থেকে বহির্গমণকারী নয়।' [সূরা আল বাক্বারাহ্ - আয়াত ১৬৬, ১৬৭] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ ۝٥٢ قَالُواْ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَٰبِدِينَ ۝٥٣﴾

'এ মূর্তিগুলো কারা? যাদের পুজায় তোমরা রত রয়েছ। তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এদের 'ইবাদত করতে দেখেছি।' [সূরা আম্বিয়া আয়াত - ৫২, ৫৩] মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠﴾

'আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।' [সূরা আল আহযাব - আয়াত ৬৭]

এই আয়াতগুলো ও এ জাতীয় অর্থবোধক আয়াত দ্বারা মুক্বাল্লিদদেরকে সতর্ক ও সাবধান করা হয়েছে। যদিও এ আয়াতগুলো কাফিরদের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছিল কিন্তু তা মুক্বাল্লিদদের ক্ষেত্রেও একই কারণ বিদ্যমান থাকায় ব্যবহার করা সঠিক হবে। আর উসূল এর প্রতিষ্ঠিত নীতি হচ্ছে: "শব্দের ব্যাপকতা দ্বারা শিক্ষা নিতে হবে নির্দিষ্ট কারণ দ্বারা নয়। কারণ পাওয়া না পাওয়ার সাথে হুকুম পরিবর্তন হয়।"

আহলুল 'ইলম (বিদ্বানেরা) এ আয়াতগুলো দ্বারা তাক্বলীদ বাতিলকরণের দলীল পেশ করেছেন। এগুলো কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে বলে তারা এ থেকে দলীল নিতে বিরত থাকেননি।

ইবনু 'আব্দুল বার মুত্তাসিল সানাদে মু'আয রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, তোমাদের পরে এমন একটি যুগ আসবে তখন সম্পদ বেশী হবে। আর তখন কুরআন উন্মুক্ত হবে এমনকি তা মু'মিন, মুনাফিক্ব, মেয়ে, ছেলে, কালো ও লালবর্ণের সকলেই তা পাঠ করবে। সুতরাং তোমাদের কারো একথা বলার সম্ভাবনা আছে যে, আমি

কুরআনে এই মাত্র পড়লাম। আমি মনে করি যে তারা আমাকে অনুসরণ করবে না যতক্ষণ না তাদের জন্য এটা ছাড়া অন্য নতুন কিছু নিয়ে আসা হবে। সুতরাং তোমরা সাবধান থাকবে এবং নতুন নতুন বিষয় থেকেও। কেননা প্রত্যেকটা বিদ‘আতই গোমরাহী।

তিনি আরো ইবনু ‘আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘আলিমের ভুলের অনুসরণকারীদের জন্য দুর্ভোগ। বলা হলো, তা কিভাবে? তিনি বললেন, কোনো ‘আলিম তার নিজস্ব মত অনুযায়ী কিছু বলল, অতঃপর সে (অনুসরণকারী) তার চেয়ে বেশি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত সম্পর্কে জানা ব্যক্তিকে পাওয়া সত্ত্বেও তার কথাকে ছেড়ে দিল। অতঃপর তার (ভুলকারী আলিমের) অনুসরণ অব্যাহত রাখলো।

‘আলী ইবনু আবি ত্বালিব রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেও তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই এই অন্তরগুলো সংরক্ষণকারী। আর তার উত্তমটি হলো যা কল্যাণকে সংরক্ষণ করে। মানুষ তিন প্রকারের। এক প্রকারের হলো আল্লাহ ওয়ালা ‘আলিম। আর আরেক প্রকার হলো মুক্তির পথের ছাত্র। আরেক প্রকার হলো নিম্ন শ্রেণির লোক, যারা ওয়ায়ের নামে আওয়াজ করে এরা তাদের অনুসারী। তারা ‘ইলমের আলোয় আলোকিত হতে চায় না। আর তারা বিশ্বস্ত ভিত্তিতে আশ্রয়ও পায় না।

আর তার থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, তোমরা মানুষের রীতিনীতি থেকে বেঁচে থাক। কেননা কোনো মানুষ জান্নাতবাসীর মতো ‘আমল করতে থাকে, অতঃপর তাতে আল্লাহর জ্ঞানে জাহান্নামবাসীর ‘আমল দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তারপর সে মারা গেল। আর সে জাহান্নামবাসীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

ইবনু মাস‘ঊদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, সাবধান, তোমাদের কেউ তার দীনের ব্যাপারে কখনোই যেন কারো তাক্বলীদ না করে। সেটা এভাবে যে, যদি ঐ ব্যক্তি ঈমান আনে তবে সেও ঈমান আনবে আবার যদি ঐ ব্যক্তি কুফুরী করে তবে সেও কুফুরী করবে; কেননা খারাপের মধ্যে কোনো আদর্শ নেই।

وروى ابْن عبد الْبر بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَوْف بن مَالك الاشجعي قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تفترق أمتِي على بضع وَسبعين فرقة أعظمها فتْنَة قوم يقيسون الدّين برأيهم يحرمُونَ مَا أحل الله وَيحلونَ بِهِ مَا حرم الله

ইবনু ‘আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ তার সানাদে ‘আউফ ইবনু মালিক আল-আশজাঈ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাত সত্তরের বেশি (তেহাত্তর) ভাগে বিভক্ত হবে। তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি ফিতনাবাজ হবে সে সম্প্রদায় যারা নিজেদের মতামত দ্বারা তাদের দীনে ক্বিয়াস করে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করে, আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করে। বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহও হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল ক্বইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ হাদীছের সমস্ত সূত্র উল্লেখ করে বলেন, হাদীছটির সানাদের সকল রাবী বিশ্বস্ত হাফিয। তবে জারীর ইবনু ‘উসমান ছাড়া। এ সত্ত্বেও ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার ছ্বহীহ বুখারীতে তার থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি তার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার নামের সাথে যেসব বিচ্যুতির কথা আরোপ করা হয় তিনি তা থেকে মুক্ত।

ইবনু ‘আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ তার নিজস্ব সানাদে আবূ হুরায়রাহ্ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই উম্মাত কিছুদিন আল্লাহর কিতাব দ্বারা ‘আমল করবে এবং কিছুদিন আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী ‘আমল করবে। অতঃপর তারা ব্যক্তিগত মতামত দ্বারা ‘আমল করবে। সুতরাং যখন তারা তা করবে, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে তিনি অন্য সানাদে ও এটা বর্ণনা করেছেন, যাতে জাবারাহ্ ইবনুল মুগলিস নামের বর্ণনাকারী আছে। তবে তার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের কথা রয়েছে।

তিনি ‘উমার ইবনুল খত্ত্বাব রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে সানাদ সহকারে আরো বর্ণনা করেছেন যে তিনি মিম্বারে থাকাবস্থায় বলেন, হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত মতামত আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে যা এসেছে তা কেবলই নিশ্চিত জ্ঞান। কেননা আল্লাহ তাকে তা দেখিয়েছিলেন। আর যদি তা আমাদের কাছ থেকে আসে তা হচ্ছে ধারণা বা কষ্ট।

আল-মাদখাল নামক কিতাবে ইমাম বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ তা উল্লেখ করেছেন। ইবনু 'আব্দুল বার রহিমাহুল্লাহ 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হতে সানাদ সহকারে আরো বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ব্যক্তিগত মতামত প্রদানকারীগণ সুন্নাতের শত্রু। হাদীছসমূহ তাদেরকে অক্ষম করে দিয়েছে এ ব্যাপারে যে তারা সেগুলোকে আয়ত্ত্ব করবে। আর (একারণেই) তারা হাদীছ বর্ণনা করবে এই সৌভাগ্য তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা ব্যক্তিগত মতামত থেকে সাবধান থেকো।

ইবনু 'আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ উমার ইবনুল খত্ত্বাব রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হতে সানাদ সহকারে আরো বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের দীনে ব্যক্তিগত মতামত থেকে সাবধান থেকো। তার থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ব্যক্তিগত মতামত প্রদানকারীগণ সুন্নাতের শত্রু। তারা তাকে সংরক্ষণ করতে অক্ষম হয়েছে। আর তাদেরকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে 'আমরা জানি না' একথা বলতে তারা লজ্জা পায়। তারা তাদের ব্যক্তিগত মতামত দ্বারা বহু সুন্নাতের বিরোধিতা করে। সুতরাং তোমরা সাবধান থেকো, তাদের থেকে দূরে থেকো।

ইবনু 'আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, প্রত্যক বছর এমন হবে যে তার পরের বছর এ বছর থেকে আরো খারাপ হবে। আমি বলছি না, এক বছর অন্য বছর থেকে অসম্পূর্ণ হবে। আর আমি এটাও বলছি না এক বছর অন্য বছর থেকে উর্বর হবে, এক আমীর বা নেতা অন্য নেতা থেকে উত্তম হবে। তবে তোমাদের মধ্যকার ভালো মানুষ ও 'আলিমগণ বিদায় নিবেন। এরপরে নতুন এক জাতির আগমন হবে যারা তাদের ব্যক্তিগত মতামত দ্বারা সকল বিষয় ক্বিয়াস করবে। সুতরাং তারা ইসলামকে ধ্বংস ও ভোঁতা

করে ফেলবে। ইমাম বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ এটি বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

ইবনু 'আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ আরো বর্ণনা করেছেন ইবনু 'আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, তিনি বলেন, (দীন হলো) কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব ও তার রসূল ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত। এর পরে যে তার মন মতো কথা বলল, আমি জানি না সে কথা কি তার নেকীর মধ্যে গণ্য হবে নাকি তার পাপের মধ্যে গণ্য হবে।

তিনি ইবনু 'আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জে তামাত্তু' করেছেন। একথা শুনে 'উরওয়াহ্ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তামাত্তু' হাজ্জ করতে আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু ও 'উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু নিষেধ করেছেন। অতঃপর ইবনু 'উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি খুব শিঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা বলছি আল্লাহর রসূল ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তোমরা বলছো আবূ বাকর ও 'উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন।

তিনি আরো বর্ণনা করেছেন আবূদ দারদা রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, তিনি বলেন, কে আমাকে মু'আবিয়া রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুর থেকে উযর পেশ করবে? আমি তাকে রসূল ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীছ বর্ণনা করছি। আর সে আমাকে তার ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে আমাকে সংবাদ দিচ্ছে। অনুরূপ 'উবাদাহ্ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু থেকেও বর্ণনা এসেছে।

তিনি 'উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু থেকে আরো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সুন্নাত হলো যা রসূল ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চালু করেছেন। সুতরাং তোমরা ব্যক্তি মতামতের ভুলকে জাতির জন্য সুন্নাত করো না।

তিনি আরো বর্ণনা করেছেন 'উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবায়র রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু থেকে। তিনি বলেন, বানী ইসরাঈলদের কাজ সর্বদা ঠিক ভাবে চলছিল। যখন জাতি তাদের মাঝে বন্দীদের নবজাত সন্তানদের পেল, তখন তারা

তাদের ব্যাপারে ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণ করে বানী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করে দিলো।

তিনি আরো বর্ণনা করেছেন শা'বী রহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন, তোমরা ক্বিয়াস করা থেকে সাবধান থেকো। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তার কসম! যদি তোমরা ক্বিয়াসকে গ্রহণ করো, তবে অবশ্যই তোমরা হারামকে হালাল করবে এবং হালালকে হারাম করবে।

তবে তোমাদের কাছে যা পৌঁছেছে, যে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছাহাবীদের থেকে সংরক্ষণ করেছে তোমরা তা সংরক্ষণ করো। ইবনু 'আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ আরো বর্ণনা করেছেন, ব্যক্তিগত মতামতকে তিনি নিন্দা করেছেন এবং তা থেকে মুক্ত থাকতে বলেছেন। আর তা থেকে তিনি পালায়ন করতে বলেছেন। এ শব্দগুলোর প্রায় কাছাকাছি মাসরূক্ব, ইবনু সীরীন, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, সুফয়ান, শুরায়হ, হাসান বাছরী ও ইবনু শিহাব থেকে বর্ণনাও এসেছে।

ত্ববারী রহিমাহুল্লাহ তার কিতাব তাহযীবুল আছারে ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন স্বীয় সানাদে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন আর এ বিষয়টি (ইসলামী শরী'আত) পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং উচিত হলো আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদাঙ্কের অনুসরণ করা। ব্যক্তি মতামতের অনুসরণ না করা। কেননা যখন তুমি কোনো ব্যক্তিগত মতামতকে অনুসরণ করবে তখন অন্য লোক এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী মতামত নিয়ে আসবে, তখন তুমি তাকে অনুসরণ করতে থাকবে, আবার অন্য জন কোনো শক্তিশালী মত নিয়ে আসলে তুমি তার অনুসরণ করবে, আর এটা তাহলে পূর্ণতা পাবে না। ইবনু 'আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ মালিক ইবনু দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ক্বতাদাহ্ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেন, তুমি কি জান তুমি আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে দাঁড়িয়ে কোনো জ্ঞান বর্ণনা করছো? আমি বললাম, (আমি বর্ণনা করছি) এটা ঠিক নয় আর এটা ঠিক।

ইবনু 'আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ আওযাঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে আরো বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তোমার উচিত হলো সালাফদের দলীল ভিত্তিক

কথার অনুসরণ করা; যদিও লোকজন তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে। আর তোমার উচিত হলো ব্যক্তিগত মতামত থেকে সাবধান থাকা। যদিও তাদের চাকচিক্যময় কথা তোমাকে অভিভূত করে।

অনুরূপভাবে তিনি ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তুমি যা জান তাই বলো, অতঃপর তার দলীল পেশ করো। আর যা জান না সে বিষয়ে চুপ থাক। আর তোমার কর্তব্য হলো মানুষের নিকৃষ্ট তাক্বলীদ না করা।

ক্ব‘নাবী রহিমাহুল্লাহ থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মালিক রহিমাহুল্লাহ এর কাছে যেয়ে তাকে কাঁদতে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে ক্ব‘নাবের পুত্র আমার কাছ থেকে (নিজস্ব মতামত বা রায়) যা বেরিয়ে গেছে তার ব্যাপারে আফসোস! হায়! আমি যদি এ ব্যাপারে আমার বলা প্রতিটি কথাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করতে পারতাম! আমার কাছ থেকে যা বের হওয়ার তা বের হয়ে গেছে যার মধ্যে এই এই মত ও এই এই মাসআলাসমূহ ছিল, অথচ আমার ক্ষমতা ছিল যে আমি তা বলবো না।

সাহনূন থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি জানি না এটা কোন ব্যক্তিগত মতামত যার দ্বারা রক্তপাত ঘটে, লজ্জাস্থান বৈধ হয় এবং হক্ব বা অধিকারসমূহ নিশ্চিত হয়!

অনুরূপভাবে আইয়ূব থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাকে বলা হলো, আপনি রায় বা ব্যক্তি মতামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না কেন? আইয়ূব বলেন, গাধাকে বলা হলো তোমার কি হয়েছে তুমি জাবর কাটো না কেন? সে বলল, আমি বাতিলকে চিবানো অপছন্দ করি। শা’বী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, মাসজিদের এই সকল গোত্র আমার কাছে এই মাসজিদকে অপছন্দনীয় করে তুলেছে এমনকি তা আমার ঘরের আবর্জনা থেকেও বেশী অপছন্দনীয় করে দিয়েছে। তখন তাকে বলা হলো, তারা কারা? তিনি বললেন, এ সকল ব্যক্তিগত মতামত পোষণকারী। আর ঐ মাসজিদে হাকাম ও হাম্মাদ আর তাদের (দুজনের) সাথীগণ ছিল।

ইবনু ওয়াহাব উল্লেখ করেছেন। তিনি মালিক রহিমাহুল্লাহ কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমাদের পূর্ব যুগের সালাফদের কোনো বিষয় এমন ছিল না। আর আমি কাউকে পাইনি যার অনুসরণ করব যে কোনো বিষয়ে বলবে এটা হারাম, এটা হালাল। তারা এ বিষয়ে মোটেও অসচেতন ছিলেন না। তারা কেবল বলত, আমরা এটা অপছন্দ করি, আমরা এটাকে ভালো মনে করি। এটা উচিত। আর এটা এমন হবে বলে আমরা মনে করি না।

আর মালিক রহিমাহুল্লাহ এর কতিপয় অনুসারী এই কথার প্রেক্ষিতে তার থেকে বৃদ্ধি করেছেন। তিনি বলেন, তারা বলতেন না এটা হালাল আর এটা হারাম। তুমি কি মহান আল্লাহর বাণী শোনোনি। তিনি বলেন,

﴿قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾

বলুন! তোমরা আমাকে জানাও আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযক্ব দিয়েছেন, তারপর তোমরা তার থেকে কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ। বলুন! আল্লাহ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছেন নাকি তোমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ রটনা করছো? [সূরা ইউনুস - আয়াত ৫৯]

হালাল সেটাই যা আল্লাহ ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল করেছেন। আর হারাম হলো তাই যা আল্লাহ ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করেছেন।

আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ থেকে ইবনু ‘আব্দুল বার রহিমাহুল্লাহ আরো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি আওযাঈ রহিমাহুল্লাহ এর মত, মালিক রহিমাহুল্লাহ এর মত ও আবূ হানিফা রহিমাহুল্লাহ এর মত সবই আমার কাছে সমান। গ্রহণযোগ্য দলীল হচ্ছে শুধুমাত্র আছার বা হাদীছ।

তিনি অনুরূপভাবে সাহল ইবনু আব্দিল্লাহ আত-তাসতারী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যে ‘ইলম সম্পর্কে কোনো কিছু নতুন করে

আবিস্কার করল তাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে। যদি তা সুন্নাত অনুযায়ী হয় তবে সে মুক্তি পাবে। নতুবা সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদীছে উল্লেখিত বিদ‘আতের তাফসীরে শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خير الحَدِيث كتاب الله وَخير الْهدى هدى مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَشر الْأُمُور محدثاتها وكل بِدعَة ضَلَالَة

“সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম পথ নির্দেশনা হলো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথ নির্দেশনা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো তাতে নতুন আবিষ্কৃত বিষয় (বিদ‘আত)। আর প্রত্যেকটি বিদ’আতই পথভ্রষ্টতা।” কাজ কর্মে বিদ’আত দু’ ধরনের:

প্রথমটি হলো - যা কুরআন, সুন্নাহ্ ও আছারের বিপরীত হয়, অথবা ইজমার বিপরীত হয়। এসকল বিদ‘আতই হলো পথভ্রষ্টতা।

দ্বিতীয়টি হলো- যা কল্যাণের জন্য নতুনভাবে তৈরী করা হয়েছে। আর এ উম্মতের কেউ তার বিরোধিতা করেনি। এ নতুন তৈরী কাজটি নিন্দিত নয়। (উদাহরণস্বরূপ) রমযান মাসে তারাবীর ব্যাপারে উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এটা কতই না উত্তম বিদ’আত। আল-মাদখাল নামক কিতাবে বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে নিয়ে এসেছেন, তিনি বলেন, তোমরা অনুসরণ করো, বিদ’আত করো না। কেননা তোমাদের জন্য যথেষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ‘উবাদাহ্ ইবনুস সমিত রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:

يكون بعدِي رجال يعرفونكم مَا تنكرون وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تعرفُون فَلَا طَاعَة لمن عصى الله وَلَا تعملوا

“অচিরেই আমার পরে অনেক লোক এমন হবে তোমরা যা পছন্দ কর তারা তা অপছন্দ করে, আর তোমরা যা অপছন্দ কর তারা তা পছন্দ করে। সুতরাং যে আল্লাহর অবাধ্য হবে তোমরা তার আনুগত্য করবে না। আর তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত দ্বারা আমল করবে না।”

‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: তোমরা তোমাদের দীনে ব্যক্তিগত মতামত (প্রদান ও গ্রহণ করা) থেকে বেঁচে থাকবে। আর তিনি তার থেকে আরো বর্ণনা করেছেন এমন সানাদে যার বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমরা দীনের মধ্যে ব্যক্তিগত মতামতকে পরিত্যাগ কর।

তিনি ‘আলী ইবনু আবি ত্বলিব রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে আরো বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, দীন যদি ব্যক্তিগত মতামত দ্বারা চলতো তবে মোজা মাসাহ করার সময় ওপরে মাসাহ না করে নিচে মাসাহ করাটা বেশি যুক্তিযুক্ত হতো। তবে আমি আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মোজা মাসাহ করার সময় উপরে মাসাহ করতে দেখেছি। এটা একটা প্রসিদ্ধ আছার বা ছাহাবীর বর্ণনা। ইমাম বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ ব্যতীত অন্যরাও এটা বর্ণনা করেছেন। বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ আরো বর্ণনা করেছেন। যা আছার বা ছাহাবীদের উক্তিকে অনুসরণ করা ও ব্যক্তি মতামতের অনুসরণ করা থেকে পালায়ণ করার প্রতি দিক-নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষেত্রে উপকারে আসে। তিনি বর্ণনা করেছেন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে, ইবনু সীরীন রহিমাহুল্লাহ থেকে, হাসান বাছরী রহিমাহুল্লাহ থেকে, শা‘বী রহিমাহুল্লাহ থেকে, ‘আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ থেকে, ‘আব্দুল ‘আযীয ইবনু আবি সালামাহ্ রহিমাহুল্লাহ থেকে, আবূ হানিফা রহিমাহুল্লাহ থেকে, ইবনু ‘আউফ রহিমাহুল্লাহ থেকে, আল আওযায়ী রহিমাহুল্লাহ থেকে, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ থেকে, শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে, ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদাম রহিমাহুল্লাহ থেকে এবং মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ থেকেও।

আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ, ইবনু মাজাহ রহিমাহুল্লাহ ও হাকিম রহিমাহুল্লাহ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইলম বা জ্ঞান তিন প্রকারঃ আয়াতে মুহকামার জ্ঞান, সুন্নাত ক্বয়িমাহ্ বা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের জ্ঞান ও ফারিযায়ে ‘আদিলাহ্ এর জ্ঞান। আর এ ছাড়া সকল প্রকারের ‘ইলম অতিরিক্ত।[৯] হাদীছটি দ্বঈফ হওয়ার কারণঃ এর সানাদে ‘আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ আল-ইফরীক্বী এবং ‘আব্দুর রহমান ইবনু রাফি’ তাদের দু’জনের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের কথা রয়েছে।

ইবনু ‘আব্দুল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আস-সুন্নাতুল ক্বয়িমাতু’ অর্থ হলো প্রতিষ্ঠিত, সর্বদা চলমান, আর তা ‘আমলের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা। আর ‘ফারিযায়ে ‘আদিলাহ্’ হলো তা আমল ওয়াজিব হওয়া ও সত্যতার ক্ষেত্রে কুরআনের বরাবর হওয়া।

দায়লামী তার মুসনাদুল ফিরদাউস নামক কিতাবে বলেন, আর আবূ নু‘আয়ম ও ত্ববারানী আল আওসাত্ব নামক কিতাবে, আর দারাক্বুত্বনী ও ইবনু ‘আব্দিল বার রহিমাহুমাল্লাহ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার ইবনিল খত্ত্বাব রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা এর থেকে মাওক্বূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। জ্ঞান হলো তিনটি জিনিসঃ

এক. স্পষ্টভাষী কিতাব

দুই. অতীত হওয়া সুন্নাহ এবং

তিন. ‘আমি জানি না’ এ কথা বলা

এর সানাদ হাসান। ইবনু ‘আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ ‘ইবনু ‘আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সকল বিষয় তিনটি প্রকারে সীমাবদ্ধ। তা হলো-

এক. এমন বিষয় যার উত্তমতা তোমার কাছে সাব্যস্ত, সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করবে।

---

[৯] দ্বঈফ, আবূ দাউদ ২৮৮৫, ইবনু মাজাহ ৫৪, মিশকাতুল মাসাবীহ ২৩৯

দুই. এমন বিষয় যার মিথ্যা হওয়াটা তোমার কাছে সাব্যস্ত, সুতরাং তুমি তা বর্জন করবে।

তিন. আর এমন বিষয় যা তোমার নিকট মতভেদপূর্ণ মনে হবে তুমি তা আলিমের কাছে সোপর্দ করবে।

মোটকথা রায় বা ব্যক্তিগত মতামত কোনো 'ইলম নয়। এ ব্যাপারে ছাহাবী, তাবিঈ ও তাবে তাবিঈগণের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। ইবনু 'আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ উম্মাতের সালাফ ও পূর্ববর্তী কোনো আলিম রায় বা ব্যক্তিগত মতামত বাস্তবিক অর্থে কোনো 'ইলম নয় - একথা নিয়ে মতভেদ করেছেন বলে আমি জানি না। তিনি বলেন, জ্ঞানের উসূল বা মূলনীতি হলো কুরআন ও সুন্নাহ্।

ইবনু 'আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ 'আলিম ও দার্শনিকদের নিকট জ্ঞানের সংজ্ঞা হলো-

যার কাছাকাছি অর্থ এমন: যা তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছ এবং তোমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার কাছে কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পৌঁছেছে এবং তার কাছে সেটি স্পষ্ট হয়েছে, সেই (প্রকৃতপক্ষে) ঐ বিষয়টি জানতে পেরেছে। এর উপরে ভিত্তি করে বলা যায় যে, যার কাছে কোন বিষয়ের দৃঢ় জ্ঞান পৌঁছেনি এবং সে তাক্লীদ ভিত্তিক কথা বলে, সে আসলে জানে না।

আলিমদের জামা'আতের নিকটে তাক্লীদ ইত্তিবা' (অনুসরণ) থেকে আলাদা বস্তু। কেননা ইত্তিবা' (অনুসরণ) হচ্ছে তুমি কোন ব্যক্তির কথাকে অনুসরণ করবে এ মর্মে যে, তার মতের বিশুদ্ধতা ও তার অতিরিক্ত কথার বাইরে দলীলের কারণে তোমার কাছে তা স্পষ্ট হয়েছে।

আর তাক্লীদ হলো অন্যের কথা দ্বারা কথা বলা, (তুমি স্বাধীন ভাবে) যে তুমি কিছু বোঝ না। আর তুমি কথার শব্দ বা অর্থ কোনো কিছুই বোঝ না। আর তুমি এছাড়া অন্য কিছুকে অস্বীকার করো। আর যদি তা তোমার কাছে ভুলও মনে হয় তবুও তুমি তার বিরোধিতার ভয়ে তার অনুসরণ কর। আর তোমার কাছে তার কথার অগ্রহণযোগ্যতাও স্পষ্ট হয়ে গেছে।

আর এভাবে মহান আল্লাহর দীনের মধ্যে কথা বলা (তাক্বলীদ করা) হারাম।

নিশ্চয়ই রায় বা ব্যক্তিগত মতামত ‘ইলম বা জ্ঞান নয় এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ‘আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন আর যার দলীলগুলোর মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহর বাণী-

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾

“আর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের দ্বন্দ লাগে তবে তোমরা আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে তা ফিরিয়ে দিবে।” [সূরা আন নিসা ৪:৫৯]

‘আত্বা ইবনু আবী রবাহ, মায়মূন ইবনু মিহরান ও অন্যরা বলেছেন, আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া অর্থ হলো তার কিতাবের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, আর তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া অর্থ তার মৃত্যুর পরে তার সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া।

‘আত্বা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহর বাণীর তাফসীরে তিনি বলেন -

﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য কর।

‘আত্বা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করা হলো কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণ করা। আর

﴿وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾

তিনি বলেন উলুল আমর হলো উলুল 'ইলম ও ফিক্বহ। আর মুজাহিদও অনুরূপ বলেছেন। আর সুন্নাত থেকেও এটাই প্রমাণিত হয়।

হাদীছ থেকে দলীল হচ্ছে: 'ইরবাদ্ব ইবনু সারিয়াহ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু এর হাদীছ। যা সুনান গ্রন্থসমূহে এসেছে এবং এর রাবীগণ ছ্বহীহুল বুখারীর রাবী। তিনি ('ইরবাদ্ব) বলেন,

وعظنا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم موعظة ذرفت مِنْهَا الْعُيُون ووجلت مِنْهَا الْقُلُوب فَقُلْنَا يَا رَسُول الله إِن هَذِه موعظة مُودع فَمَاذَا تعهد إِلَيْنَا فَقَالَ تركتكم على الْبَيْضَاء لَيْلهَا كنهارها لَا يزِيغ عَنْهَا بعدِي إِلَّا هَالك وَمن يَعش مِنْكُمْ فسيرى اخْتِلَافا كثيرا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عرفتم من سنتي وَسنة الْخُلَفَاء المهديين الرَّاشِدين وَعَلَيْكُم بِالطَّاعَةِ وَإِن كَانَ عبدا حَبَشِيًّا عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ إِنَّمَا الْمُؤمن كَالْجمَلِ الْأَنف كلما قيد انْقَادَ

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন ওয়ায করেন যাতে আমাদের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে ও তাতে আমাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মনে হচ্ছে এটা একটি বিদায়ী ভাষন। সুতরাং আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিবেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ দীনের ওপর ছেড়ে যাচ্ছি যার রাত দিনের মত স্বচ্ছ। আমার পরে ধ্বংসকারী ছাড়া কেউ তা থেকে বিচ্যুত হবে না। আর তোমাদের কেউ বেঁচে থাকলে অচিরেই অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন তোমাদের উচিত হবে আমার যে সকল সুন্নাত যা তোমরা চেন তা ও সঠিক পথের হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকা। তোমাদের আনুগত্য করা উচিত যদিও একজন কালো অসুন্দর গোলাম তোমাদের নেতা হয়। তোমাদের

মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাক। মু'মিন ব্যক্তি উটের মত। তার নাকে যখনি রশি বাঁধা থাকে তখন সে আনুগত্য করতে থাকে।[১০]

এ হাদীছটি ইবনু 'আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহও ছ্বহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তাতে বৃদ্ধি করেছেন, আর তোমরা নতুন আবিষ্কৃত বিষয় থেকে সাবধান থেকো। কারণ প্রত্যেকটি নব আবিস্কৃত বিষয় বিদ'আত। আর প্রত্যেকটি বিদ'আতই গোমরাহী।

এ অধ্যায়ে অনেক হাদীছ রয়েছে। আর রায় বা ব্যক্তিগত মতামতকে দূর করতে যা যথেষ্ট। আর এসব রায় বা ব্যক্তিগত মতামত দীনের কিছুই না।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য আমার দীনকে পরিপূর্ণ করলাম, আর আমার নি'আমতকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করলাম এবং আমি ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে সন্তুষ্ট হলাম।" [সূরা আল-মায়িদা ৫:৩]

সুতরাং আল্লাহ যখন তার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যুর আগেই তার দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন, সুতরাং এসব রায় বা ব্যক্তিগত মতামত কী যা তারপরে বিদ'আতীরা তৈরী করেছে? আল্লাহ তার দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। আর যদি (তাদের রায় বা মতামতসমূহ) তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দীনের অংশ হয়ে থাকে, তবে তা কুরআনকে খণ্ডন করার নামান্তর। আর যদি তা দীনের অংশ না হয়ে থাকে, তবে যা দীনের অংশ নয়, তাতে মশগুল হওয়ার কীইবা লাভ থাকতে পারে? সুতরাং এটা একটা অকাট্য দলীল যা ব্যক্তি মতামতে বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনও খণ্ডন করতে পারে না।

[১০] ছ্বহীহ: সুনান ইবনু মাজাহ; হা/৪৩। সুনান আবু দাঊদ; হা/৪৬০৭, সুনান আত-তিরমিযী; হা/২৬৭৬।

সুতরাং এ আয়াতেকারীমাকে প্রথম ধরো যা ব্যক্তিগত মতামত পোষণকারীদের গালে চপেটাঘাত করে। আর তাদের নাককে ধুলোয় ধুসরিত করে দেয়। আর তাদের দলীল গুলোকে বাতিল করে দেয়। সুতরাং আল্লাহ তার কিতাবে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি তার দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। আমাদের কাছে এ সংবাদ আল্লাহর কাছ থেকে আসার আগে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেননি। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে কোনো কিছু আমাদের জন্য নিয়ে আসবে, আর সে ভেবে নিবে এটাই আমাদের দীন। আমরা তাকে বলবো আল্লাহ তোমার চেয়ে অধিক সত্যবাদী। সুতরাং তুমি চলে যাও, তোমার ব্যক্তি মতামতের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

হায়! মুক্বাল্লিদ যদি এই আয়াতকে সঠিকভাবে বুঝতে পারত! যতক্ষণ না সে এখান থেকে পরিত্রাণ পায় এবং তাক্বলীদ ছেড়ে দেয়। এ সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি সব কিছু জ্ঞান দিয়ে বেষ্টন করে আছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ﴾

"আমি কিতাবে কোনো কিছুই ছাড়িনি।" [সূরা আল-আনআম ৬:৩৮]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾

"আর আমি আপনার উপরে কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ। পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত ৮৯]

অতঃপর তিনি তার কিতাব দ্বারা বান্দাদের মাঝে ফায়ছালা করার নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ﴾

"আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি। যাতে আপনি আল্লাহ যা আপনাকে জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন। আর আপনি বিশ্বাসভঙ্গ কারীদের সমার্থনে বিতর্ক করবেন না।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০৫] তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ ﴾

"হুকুম শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই, তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং ফায়ছালাকারীদের মাঝে তিনিই শ্রেষ্ঠ।" [সূরা আল-আন'আম - আয়াত ৫৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফায়ছালা করে না, তারাই কাফির।" [সূরা আল-মায়িদাহ্ - আয়াত ৪৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফায়ছালা করে না, তারাই যালিম।" [সূরা আল-মায়িদাহ্ - আয়াত ৪৫] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴾

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফায়ছালা করে না, তারাই ফাসিক্ব।" [সূরা আল-মায়িদাহ্ - আয়াত ৪৭]

আর তিনি তার কিতাবে তার বান্দাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন তার রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾

“আর তোমাদের রসূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো, আর তিনি যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।” [সূরা আল-হাশর - আয়াত ৭]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

“বলুন! তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাইলে আমার আনুগত্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো বাসেন।” [সূরা আলে ‘ইমরান - আয়াত ৩১] মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

“আর তোমরা আল্লাহ ও তার রসূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্য কর, তাহলে সম্ভবত তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে। [সূরা আলে ‘ইমরান- আয়াত ১৩২] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَـٰفِرِينَ﴾

"বলুন! তোমরা আল্লাহ ও তার রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্য কর। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।" [সূরা আলে 'ইমরান - আয়াত ৩২]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴾

"আর যারা আল্লাহ ও তার রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্য করবে তারা থাকবে নি'আমত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে- তারা হলেন, নাবীগণ, সিদ্দিক্বগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীলগণ। আর সঙ্গী হিসাবে তারা কতই না উত্তম।" [সূরা আন নিসা ৪:৬৯] মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾

"আর যে রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল আমি তাদের সংরক্ষণকারী হিসাবে আপনাকে প্রেরণ করিনি।" [সূরা আন নিসা ৪:৮০]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের, অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ

ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" [সূরা আন নিসা - আয়াত ৫৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ﴾

"কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটাই হলো মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ্ ও তার রসূলের অবাধ্য হলে এবং তার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" [সূরা আন নিসা, আয়াত ১৩-১৪] মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴾

"আর তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। [সূরা আনফাল, আয়াত ৪৬] মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا عَلَيۡهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيۡكُم مَّا حُمِّلۡتُمۡۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ﴾

“বলুন, ‘তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর।’ তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনিই দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী; আর তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, মূলত রসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।” [সূরা আন-নূর, আয়াত ৫৪] মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾

“আর তোমরা ছ্বলাত কায়েম কর, যাকাত দাও ও রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা যায়।” [সূরা আন নূর- আয়াত ৫৬]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا﴾

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৭১] মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ৩৩] মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾

“মুমিনদের উক্তি তো এই- যখন তাদের মধ্যে বিচার- ফায়ছালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এবং তার রসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে,

'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।' আর তারাই সফলকাম। [সূরা আন-নূর, আয়াত ৫১] মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে উত্তম আদর্শ।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত ২১]

আল্লাহ ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়ার দলীলগুলোকে অস্বীকার কারার মধ্যে কোনো ফায়েদা নেই। আর কোনো মুসলিমই তার বিরোধিতা করে না। আর যে তা অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে মুসলিমদের দল থেকে বের হয়ে যায়। আমরা এ আয়াতগুলো উল্লেখ করেছি একারণে যে, যেন মুক্বাল্লিদের মন নরম হয়। কারণ তাদের অন্তর প্রস্তরখন্ডের মত শক্ত হয়ে গেছে। আর এ রকম আদেশ শুনলে হতে পারে যে মুক্বাল্লিদ এই আদেশগুলো অনুযায়ী আমল করবে এবং আল্লাহর আদেশ পালনের নিমিত্তে নিজের দীনকে সে আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হতে গ্রহণ করবে।

আর এ প্রকারের আনুগত্য যদিও সকল মুসলিমেরই জানা আছে যেমনটা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে মানুষ অন্যমনস্ক থাকে কুরআনের বিপদ সংকেত ও রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধমক থেকে। সুতরাং যখন আমি তা উল্লেখ করেছি তখন সে (এখান থেকে) ধমকপ্রাপ্ত হবে। বিশেষ করে যে তাক্বলীদের ওপর বেড়ে উঠেছে। আর তার পূর্ববর্তীদেরকে তাক্বলীদের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছে। তা থেকে দূরে সরে থাকতে দেখতে পায়নি। তার হৃদয়ে এটাই রয়েছে যে, দীন ইসলাম এটাই যার ওপর তারা (তাদের পূর্ববর্তীগণ) ছিল। আর যা তার বিরোধী তা দীন (ইসলাম) নয়। যখন সে নিজে পুনঃনিরীক্ষণ করে, তখন সে ফিরে আসে। একারণে তুমি এমন লোক যে এই মাযহাবগুলোর মধ্য হতে কোন একটি মাযহাব অনুসরণ করে বড় হয়েছে। এরপর জ্ঞান যাচাইয়ের আগ পর্যন্ত প্রচলিত রীতির বিপরীত সে যা শোনে, সে সেটাকে

অপছন্দ করে, তার অন্তর এগুলোকে অস্বীকার করে এবং তার প্রকৃতি বা স্বভাব সেখান থেকে পালায়ন করে। আর এ জাতীয় ব্যপার আমরা এত পরিমাণে দেখেছি এবং শুনেছি যে তা সীমায়িত করা সম্ভব নয়।

তবে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি তার জ্ঞান দিয়ে যদি তুলনা করেন দুই ব্যক্তির মধ্যে যাদের এক ব্যক্তি কোনো মাসআলায় চার মাযহাবের ইমামদের কারো অনুসরণ করল, সে মাসআলা বর্ণনা করেছেন কোনো মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি, তবে ঐ বিষয়ে সে আলিমের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই; বরং সে কেবল রায় বা ব্যক্তিগত মতামত দ্বারা তা বর্ণনা করেছে, কোনো দলীলও পেশ করেনি। অপরপক্ষে অন্য ব্যক্তি একই মাসআলায় দলীলের অনুসরণ করেছে ও কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে আঁকড়ে ধরেছে, এ দু'ব্যক্তির মাঝে এমন দূরত্ব বিদ্যমান যে দূরত্বে উটের গর্দান কাটা হয়ে থাকে, বরং তাদের উভয়ের মাঝে একত্রিতকারী কোন (ব্যক্তি বা বস্তু) নেই। যাদের একজন দলীলকে আঁকড়ে ধরেছে, সে তার ওপর যা ওয়াজিব সে তাকেই আঁকড়ে ধরেছে। আর সে তারই অনুসরণ করেছে যা শরী'আত প্রণেতা প্রথম ও শেষ, জীবিত ও মৃত সকল উম্মাতের জন্য শরী'আত সম্মত করেছেন। যাদের অপরজন হচ্ছে ঐ আলিম যে মাযহাবের ইমামদেরকে গ্রহণ করেছে শুধুমাত্র তার রায় বা ব্যক্তিগত মতামতের উপরে ভিত্তি করে। উক্ত আলিম এক্ষেত্রে শরী'আত কর্তৃক আদিষ্ট ব্যক্তি মাত্র, সে আদেশদাতা নয়। সে শরী'আতের অনুসরনকারী, অনুসৃত কেউ নয়। ঐ ব্যক্তি তার মত, যে অনুসরণ করেছে এই মর্মে যে, দুজনের উভয়ের উদ্দেশ্য হল, শরী'আত প্রণেতা কর্তৃক প্রবর্তিত বিধান অনুসরণ করা, এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, এখানে অনুসৃত ব্যক্তি 'আলিম আর অনুসরণকারী মূর্খ। সুতরাং আলিমের জন্য দলীল সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব হবে কারো কাছে শরণাপন্ন হওয়া ছাড়াই; কেননা সে 'ইলম অন্বেষণ এবং 'আলিমদের মজলিসে যাওয়ার মাধ্যমে এব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং ইজতিহাদের যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করেছে। অপরপক্ষে মূর্খ বা জাহিল ব্যক্তির জন্য দলীলের ব্যাপারে অবগত হওয়া সম্ভব হবে শরী'আতের বিজ্ঞ আলিমদের নিকট দলীল জিজ্ঞাসা করা, তাদের কাছ থেকে নছ্ব তলব করার মাধ্যমে এবং আল্লাহ কিতাব ও রসূলের ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় এব্যাপারে হুকুম কিভাবে দেওয়া হয়েছে?

সুতরাং আলিমগণ তাকে নছ্ব সম্পর্কে অবহিত করবেন, যদি সে দলীল বোঝার মত যোগ্য হয়ে থাকে। অথবা তারা তাকে নসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেবে এমন ভাষায় যা সে বুঝতে পারে। সুতরাং তারা হলেন বর্ণনাকারী আর সে হচ্ছে বর্ণনার অনুসন্ধানকারী। তাহলে এই ব্যক্তি রেওয়ায়েতের উপর আমলকারী কোন রায় বা ব্যক্তিগত মতামতের উপরে আমলকারী নয়। আর মুক্বাল্লিদ ব্যক্তিগত মতামতের উপরে আমলকারী, রেওয়ায়েতের উপরে আমলকারী নয়। যেহেতু সে অন্যের কথাকে দলীল ছাড়াই গ্রহণ করে। আর ঐ ব্যক্তি (রেওয়ায়েতের উপর আমলকারী) আলিমের নিকটে প্রশ্ন করার মাধ্যমে দলীল অনুসন্ধানকারী মাত্র, তাই সে অন্যের রেওয়ায়েত গ্রহণ করে, ব্যক্তিগত মতামত নয়। এদিক থেকে তারা উভয়ে একে অপরের বিপরীত।

সুতরাং দু'টি স্তরের মাঝে পার্থক্য লক্ষ্য করো। যদি কেউ অন্য কারো তাক্বলীদ করে, তার নিজস্ব ইজতিহাদ অনুযায়ী দলীল না পাওয়ার কারণে এরপর তার রায় বা ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করে, তবে সে মা'যূর (ওযরগ্রস্ত)। অনুরূপভাবে সে যদি ইজতিহাদে ভুল করে তবে সে মা'যূর বা অক্ষম; বরং সে সাওয়াব পেয়ে যাবে। ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীছে এসেছে,

إِذَا اجْتَهد الْحَاكِم فَأَصَاب فَلَهُ اجران وَإِن اجْتَهد فَأَخْطَأَ فَلَهُ اجْرِ

“বিচারক যখন ইজতিহাদ করে ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে, তবে সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। আর যদি সে ইজতিহাদ করে আর তাতে ভুল করে, তবে সে একটি সাওয়াব পাবে।”

এই আলিমের অবস্থা মুক্বাল্লিদের বিপরীত। কেননা সে আল্লাহর কাছে হিসাবের সময় কোন গ্রহণযোগ্য দলীল খুঁজে পাবে না। কারণ সে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে ভুলে নিপতিত ব্যক্তির তাক্বলীদ করেছে। আর মুজতাহিদ ব্যক্তিকে তার ভুলের জন্য পাকড়াও না করা এটাকে আবশ্যক করে না যে, তার মুক্বাল্লিদকেও উক্ত ভুলের কারণে পাকড়াও করা হবে না। না তা বিবেকের দাবি অনুযায়ী, না শরী'আতের দাবি অনুযায়ী আর না অভ্যাসের দাবি অনুযায়ী।

معنى أَن كل مُجْتَهد مُصِيب

‘প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক’ একথাটির অর্থ

যদি মুক্বাল্লিদ নিজের মুজতাহিদকে সর্বদা সঠিক প্রমাণের মাসআলাতে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, তাকে আমরা উত্তরে বলব, এই কথার প্রবক্তা বলেছেন, “একমাত্র মুজতাহিদই হলেন সঠিক”, এই কথার একমাত্র উদ্দেশ্য হল মুজতাহিদ ভুল করলেও গুনাহগার হবেন না, বরং তার ভুল হওয়া সত্ত্বেও তাকে (তার প্রচেষ্টার) প্রতিদান দেওয়া হবে তার যথাযথ প্রচেষ্টার পরে। প্রবক্তার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মুজতাহিদ ঐ সঠিকতা নিরূপণে সক্ষম হয়েছেন, যা সংশ্লিষ্ট মাসালায় মূলত আল্লাহর বিধান। কেননা এ বুঝ অত্র হাদীছে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তার বিপরীত। যেমন তিনি বলেন,

إِن اجْتهد الْحَاكِم فَأَصَاب فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِن أَخطأَ فَلَهُ أجر

“বিচারক যদি ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তবে তার বিনিময়ে সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। আর যদি সে ভুল করে তবে তার জন্যেও সে একটি সাওয়াব লাভ করে।”

তুমি খেয়াল কর, সমস্ত উপদলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়া হাদীছে বর্ণিত নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীটির প্রতি যে তিনি বলেছেন “আর যদি ইজতিহাদ করে সে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।”

তাহলে দীনের বিভিন্ন মাসআলায় মুজতাহিদের থেকে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সুতরাং তিনি দীনের মাসআলাতে মুজতাহিদের ইজতিহাদ থেকে প্রকশিত বিষয়সমূহকে দুইভাগে ভাগ করে দিয়েছেন:

এক. সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবে আর

দুই. সে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবে।

সুতরাং এটা কিভাবে হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি বলবে যে, সে সঠিক আর ভুল যাই করুক না কেন সে সঠিক সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছে?

অথচ রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামকরণ করেছেন 'ভুলে নিপতিত' হিসেবে। সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করে রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথার দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো মুজতাহিদের সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং এ বিষয়টি সাধারণভাবে সত্যে উপনীত হওয়াকে বোঝায়, তাহলে সে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত হল। আর তাদেরকে এমন বিষয়ে সম্পৃক্ত করল যা থেকে তারা মুক্ত। আর এ কারণেই একদল মুহাক্কিক্ব মুজতাহিদের সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মত দেওয়ার ক্ষেত্রটির ব্যাপার স্পষ্ট করেছেন। কেননা তাদের (এ কথা দ্বারা) উদ্দেশ্য হলো, তারা এমনভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যাতে ভুল হওয়াকে অস্বীকার করা যায় না। এর অর্থ এমন নয় যে, তা ভুলে নিপতিত হওয়ার বিপরীত। আর যদি সে ভুল না করে তবে কোন 'আলিম এটা বলতেন না।

আর যে ব্যক্তি এই অর্থ বুঝতে পারে না, তার কর্তব্য হলো নিজেকে দোষ দেওয়া, আর তার অযোগ্যতার উপরে পাপের দায় অর্পণ করা। আর তার থেকে যারা 'আলিমদের কথার মর্ম উদ্ধারে বেশী পারঙ্গম তারা যা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন তাদের কথা গ্রহণ করা। মুক্বাল্লিদ যদি আল্লাহর কথার দলীল দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে যে, তিনি বলেন,

﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

"সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৩]

সে ব্যক্তি জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করাকে সীমাবদ্ধ করবে কিতাব ও রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের প্রতিষ্ঠিত বিধানের ব্যাপারে, যাতে তারা তার কাছে বর্ণনা করতে পারেন যতটুকুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞসার সম্মুখীন করবেন তার বান্দাদের কাছে তার বিধানগুলো বর্ণনা করার ব্যাপারে।

এই শরী'আত সম্মত প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে শারঈ দলীল সম্পর্কে প্রশ্ন করা আর আলিমের কাছে তা জানতে চাওয়া যেন আলিম এর রাবী (বর্ণনাকারী) ও ঐ ব্যক্তি তার শ্রবণকারী হতে পারে। আর মুক্বাল্লিদ নিজেই একথা স্বীকার করে যে, সে 'আলিমের কথা গ্রহণ করবে কিন্তু তার কাছে দলীল চাইবে না।

সুতরাং আয়াতে কারীমাটি ইত্তিবা এর দলীল, তাক্বলীদের দলীল নয়। আর ইতিপূর্বে আমরা উভয়ের মাঝের পার্থক্য স্পষ্ট করেছি। এটা অনুমানের উপরে ভিত্তি করে বলা হয় যে, তা দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো সাধারণভাবে প্রশ্ন করা। অথচ পূর্বের বর্ণনা প্রসঙ্গ দেখে বোঝা যায় তা দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো খাস বা নির্দিষ্ট প্রশ্ন। এ কারণে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾

"আর আপনার আগে আমরা ওহীসহ পুরুষদেরকেই প্রেরণ করেছি; সুতরাং তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।" [সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৭]

আর আমরা ইতিপূর্বে এ আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারে 'আলিমদের বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করেছি। এখান থেকে তোমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, মুক্বাল্লিদ যে দলীল অনুমানের ভিত্তিতে পেশ করে তা অসাড়। এখানে খাস অর্থ নেওয়া হয়েছে। এটা তার বিপক্ষে দলীল, তার পক্ষে দলীল নয়। যেমন সে বলে যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো সাধারণ অর্থ।

أسئلة للمقلدين

মুক্বাল্লিদদের উদ্দেশ্যে প্রশ্নসমূহ

অতএব আমরা মুক্বাল্লিদকে আরো বলব, লেনদেন ও ইবাদাতের মাসআলাসমূহে তোমার কোন আলিমের তাক্বলীদ করা (দু'টি কারণে হতে পারে), হয়তো তুমি তাক্বলীদকে জায়িয মনে করার মাসআলার মূলে মুক্বাল্লিদ নয়তো মুজতাহিদ। যদি তুমি এ মাসআলাতে মুক্বাল্লিদ হয়ে থাক, তবে তুমি এমন মাসআলাতে তাক্বলীদ করলে, যে ব্যাপারে তাক্বলীদ করাকে তোমার ইমাম জায়িয বলেননি; কেননা এটি একটি মৌলিক মাসআলা অথচ তাক্বলীদ শুধুমাত্র শাখা মাসআলাতেই হয়ে থাকে। সুতরাং হে মিসকীন! তুমি নিজে কী করলে? আর এই অন্ধকার কূপে কিভাবে পতিত হলে অথচ তোমার কাছে এখান থেকে বের হওয়ার উপায় রয়েছে।

আর যদি তুমি এই মাসআলাতে মুজতাহিদ হয়ে থাক, তাহলে তোমার জন্য তাক্বলীদ করা বৈধ নয়; কেননা তুমি এই মৌলিক শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ জটিল বিষয়ে ইজতিহাদ করার যোগ্য নও। যদি না তুমি তাদের মধ্যে একজন হয়ে থাক, যাদেরকে আল্লাহ উপকারী 'ইলম শিক্ষা দিয়েছেন, যার মাধ্যমে সে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের হয়ে আসতে পারে। তোমার কী হল যে, তুমি নিজেকে অবৈধ বিষয়ে নিক্ষেপ করছ? তুমি আল্লাহর দীনের ব্যাপারে মানুষের তাক্বলীদ করছ। আল্লাহ তোমাকে তা থেকে পরিত্রাণ দেওয়া ও তা থেকে বের হওয়ার সক্ষমতা দান করার পরেও।

এটাই হল এমন বিষয় যার উপরে সত্য প্রতিষ্ঠিত। অর্থ্যাৎ ইজতিহাদ কোন অংশে বিভক্ত হয় না। আর যে সকল মাসআলাতে ইজতিহাদের সক্ষমতা রাখে না, সে তার কিছু মাসআলাতেও সেই সক্ষমতা রাখে না। কেননা এটি একটি যোগ্যতা যা কোন ব্যক্তি অর্জন করতে পারে গ্রহণযোগ্য তথ্যাবলী আয়ত্ত্ব করার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এবিষয়ে উপদেশ দেয় তার যোগ্যতা ধর্তব্য নয়।

সুতরাং তুমি যদি আত্মতৃপ্তিতে ভোগ যে, ইজতিহাদ বিভক্ত হতে পারে, তাহলে আমরা তোমাকে পুনরায় এই প্রশ্ন ফিরিয়ে দেব যে, তুমি কি জান যে ইজতিহাদ ইজতিহাদের দ্বারা বিভক্ত হয় নাকি তাক্বলীদের দ্বারা? যদি তুমি জেনে থাক যে, তা তাক্বলীদের দ্বারা বিভক্ত হয়ে থাকে, তাহলে আমরা বলব, এটি একটি মৌলিক মাসআলা, যাতে তোমার ও তোমার ইমামের স্বীকৃতি অনুযায়ী তাক্বলীদ করা বৈধ নয়। আর যদি তুমি তা জেনে থাক ইজতিহাদের ভিত্তিতে, তবুও সেটা একটি মৌলিক মাসআলার অন্তর্ভুক্ত, যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ইজতিহাদের সক্ষমতা দান করেছেন। তাহলে তুমি এই সক্ষমতাকে প্রশাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করছ না? কারণ তুমি মৌলিক মাসআলাতে ইজতিহাদের চেয়ে প্রশাখাগত মাসআলাতে ইজতিহাদে অধিকতর সক্ষম। সুতরাং তুমি তা প্রশাখাগত মাসআলাতেও ব্যবহার কর। আর উলুমুল ইজতিহাদের জ্ঞানকে বর্ধিত করতে থাক, যতক্ষণ না তুমি তার যোগ্য হয়ে ওঠ এবং আল্লাহ তোমাকে এই অন্ধকার থেকে মুক্তি দেন আর এই অন্ধকার তোমাকে যা শিক্ষা দিয়েছে তা থেকে তোমাকে রেহাই দেন।

কেননা তুমি যখন নিজেকে বড় ইজতিহাদের দিকে উন্নীত করবে, তখন দূরত্ব তো সামান্যই। আর যে ব্যক্তি অল্প কিছু (ইজতিহাদ) করতে সক্ষম সে পুরোপুরি করতেও সক্ষম। যে ব্যক্তি উসূলী বা মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে সত্যকে ভালোভাবে বুঝেছে সে শাখা মাসআলাতেও সেটা বুঝতে পারবে। আর অচিরেই তুমি ইজতিহাদের জ্ঞান অর্জনের পর জানতে পারবে যে, যেমনিভাবে তুমি এখন তাক্বলীদ জায়িয মনে করছ আর যে ব্যক্তি ইজতিহাদ বিভক্ত হতে পারে বলে মনে করে উভয়টিই বাতিল।

বরং তুমি যদি তোমার গোড়ামী দূরে ছুড়ে ফেলতে পারতে আর তোমার নিজেকে মুক্ত রাখতে পারতে যা আমি তোমার জন্য এই কিতাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছি তা বোঝার ক্ষেত্রে, তাহলে তোমার বিবেক ও বুঝশক্তি তোমাকে পথ দেখাত যে, এটা ইজতিহাদের জ্ঞান আয়ত্বে আনার আগ পর্যন্ত সঠিক হতে পারে। আর বুঝশক্তি এমন একটি বস্তু যা, আল্লাহ অধিকাংশ বান্দাকে দান করেছেন। সত্য ন্যায় ও ইনসাফের অধিকারীদের থেকে গোপন থাকবে না, তাই সঠিকপথ গ্রহণে সত্যের সাক্ষ্য হও।

আর একারণে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أعلم النَّاس أبصرهم بِالْحَقِّ إِذا اخْتلف النَّاس

“সবচেয়ে জ্ঞানী হলো সেই ব্যক্তি যে মানুষের মতভেদের সময় সত্যের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী দূরদর্শী ।”

হাদীছটি হাকিম তার মুসতাদরাক কিতাবে বর্ণনা করে ছ্বহীহ বলেছেন। এছাড়াও হাদীছটি অন্য অনেকেই বর্ণনা করেছেন।

যদি তোমার একগুঁয়েমি দীর্ঘ হয়ে যায়, আর প্রশস্ত এ পথে তোমার সংকীর্ণতা যদি চলতে থাকে, আর শালীনতা ব্যতীত যদি নির্লজ্জ হও, আর কোনো বাঁধা ছাড়াই আগে বাড়, তবে তুমি বলতে পার যে, তাক্বলীদ জায়িয, যদিও এটি মৌলিক মাসআলা হোক না কেন এবং মানুষেরা একমত হয়েছে যে, উসূলী বা মৌলিক মাসআলাতে তাক্বলীদ জায়িয নয়। এটি মুক্বাল্লিদ গোত্রের সন্তানদের কাছেও পরিচিত একটি ব্যাপার। তবুও আমি বলব যে, এই মাসআলাসহ সকল মৌলিক মাসআলাতে তাক্বলীদ করা বৈধ।

সুতরাং আমরা এর জবাবে আমরা বলব: তুমি কোথা থেকে তাক্বলীদ জায়িয হওয়ার বিষয়টি জানতে পারলে? এটা কি তোমার তাক্বলীদ নাকি ইজতিহাদ? যদি তুমি তাক্বলীদ করে এটা বলে থাক, তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করব যে, কে সেই ব্যক্তি তুমি যার তাক্বলীদ করছ? অথচ আমরা ইতোপূর্বেই তোমাকে বর্ণনা করেছি যে, মাযহাবসমূহের ইমামগণ তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্যরাও শাখা মাসআলাতেই তাক্বলীদ করতে থেকে নিষেধ করেছেন, মৌলিক মাসআলা তো আরো পরের কথা। যদি তুমি তাদেরকে অথবা তাদের কোন একজনকে তাক্বলীদ করে থাক আর সে যদি এমনই হয়ে থাকে যে, তুমি তার মাযহাবকে নিজের জন্য বাধ্য করে নিয়েছ তার প্রতিটি কথা দলীল চাওয়া ছাড়াই গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, তাহলে তুমি তার ব্যাপারে মিথ্যাচার করছ এবং আর তুমি মিথ্যা দ্বারা নিজেকে ত্রুটিযুক্ত করছ; কেননা অন্যরা যারা তার মাযহাব সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী এবং তারা মাযহাবের বর্ণনাসমূহকেও ভালভাবে

জানেন, তারা মাযহাবের ইমাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। আর যদি তুমি বল যে, অন্য কারো তাক্বলীদ করেছ, তাহলে সে কে? এরপরের প্রশ্ন হল, তোমার জন্য এই মাসআলাতে তার মাযহাব থেকে বের হয়ে অন্যের তাক্বলীদ কিভাবে জায়িয হল?

মোটকথা যে ব্যক্তি তার দীনকে নিয়ে ও তার নিজেকে নিয়ে এই সীমানায় খেলবে, সে পশুর মত। হায়! যদি এসকল মুক্বাল্লিদরা তাদের ইমামদের বলা সকল কথায় তাক্বলীদ করতো। যদি তারা তা করত, তবে তাক্বলীদ জায়িয হওয়ার মাসআলাতেও তারা তা করত আর তারা তো তা না জায়িয হওয়ার ব্যাপারেই বলেছেন। যেমনটা পূর্বের আলোচনা থেকে তুমি জানতে পেরেছ।

আর যখন তারা এ সকল মাসআলায় তাদের অনুসরণ করবে, তাদের জন্য তা পরিপূর্ণ হবে না সকল মাসআলায় তাক্বলীদকে না ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত। তারপর তারা নিজেরা পরিতৃপ্ত হবেন, আর নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবেন এই জালের রশিগুলোতে পতিত হওয়া থেকে।

আমরা এই মুক্বাল্লিদকে আরো বলবো, তিনি (তার নিজের মধ্যে) ইজতিহাদের জ্ঞানকে একত্রিত করেছেন তুমি এটা কোথা থেকে (কিভাবে) জানলে? অতঃপর আমরা তাকে বলবো, হে মিসকীন! তোমার এ জ্ঞান কোথা থেকে আসলো? তুমি তো নিজেই স্বীকৃতি দাও যে তুমি একজন জাহিল বা মূর্খ, তোমার এ দাবিতে তুমি মিথাবাদী! তোমার যদি মূর্খতা না থাকতো তবে তুমি অন্যের তাক্বলীদ করতে না। আর যদি সে বলে, আমি ‘আলিমদের সংবাদ থেকে শুনেছি যে, আমার ইমাম ইজতিহাদের জ্ঞানকে একত্রিত করেছেন।

তাহলে আমরা বলবো, যে তোমাকে সংবাদ দিয়েছে সে কি মুক্বাল্লিদ নাকি মুজতাহিদ? যদি তুমি বল সে মুক্বাল্লিদ, তাহলে মুক্বাল্লিদ এটা কিভাবে জানবে? সেও তো তোমার মত স্বীকার করে যে সে একজন মূর্খ। আর যদি তুমি বল, তোমাকে সংবাদ দিয়েছে একজন মুজতাহিদ। তাহলে আমরা তোমাকে বলবো, তুমি কোথা থেকে জানলে যে সে একজন মুজতাহিদ? কারণ তুমি তো নিজেকে একজন মূর্খ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছ।

অতঃপর আমরা তোমাকে পুনরায় প্রথম প্রশ্নে ফিরিয়ে আনছি যার কোনো শেষ নেই।

অতঃপর মুক্বাল্লিদকে আমরা বলছি, তুমি কোথা থেকে জানলে যে, হক্ব বা সত্য তোমার ইমামের হাতে যার তাক্বলীদ তুমি করছ? অথচ তুমি জান সকল আলিম মতবিরোধপূর্ণ সকল মাসআলায় তার বিরোধিতা করেছেন। যদি তুমি বলো, আমি তো বিষয়টি তাক্বলীদের মাধ্যমে জেনেছি, তাহলে বলবো মুক্বাল্লিদ সত্য ও সঠিক জিনিস কোথা থেকে জানবে? সে তো নিজেই স্বীকার করে যে সে দলীল তালাশ করে না, আর যখন দলীল আনা হয় তখন সে তা বোঝে না! তাহলে হে মিসকীন! তুমি এটা কিভাবে জানলে! তোমার নিজের ওপর মিথ্যা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। তোমার ভাষাই তো তা বাতিল করে দেয়। বরং তোমার বিরুদ্ধে সকল মুক্বাল্লিদ ও মুজতাহিদ সাক্ষ্য দেয়, তোমার দাবির বিপরীতে। আর যদি তুমি বল আমি ইজতিহাদের মাধ্যমে তা জানতে পেরেছি। তাহলে (আমরা বলব) তুমি মুক্বাল্লিদ নও। তুমি তাক্বলীদের যোগ্য নও; বরং তোমার জন্য তাক্বলীদ হারাম। তাহলে তোমার কি হয়েছে যে, তুমি তোমার ওপর আল্লাহর নি'আমতকে অপছন্দ ও অস্বীকার করো। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾

"আর আপনি আপনার রবের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দিন।" [সূরা আদ-দুহা, আয়াত ১১]

আর আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার নি'আমতের চিহ্ন তার বান্দার ওপর দেখতে ভালোবাসেন।"[১১]

[১১] হাসানঃ সুনানুত তিরমিযী, হা/২৮১৯।

আর জ্ঞানের নি'আমতের চিহ্ন হলো, একজন 'আলিম তার 'ইলম বা জ্ঞান অনুপাতে 'আমল করবেন। আর তিনি যে 'ইবাদত করবেন তা তিনি গ্রহণ করবেন আল্লাহ তার কিতাবে যা আদেশ করেছেন ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হাদীছে বলেছেন সেখান থেকে। 'ইবাদত নিতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যার দলীল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর এটা এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে সবাই একমত। এব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। আর যাইহোক না কেন, তুমি যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়াই কুরআন ও সুন্নাহর উপরে আমল করে এবং সন্দেহাতীত ব্যাপার থেকে সন্দেহযুক্ত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে, তার থেকে কম যোগ্যতা সত্ত্বেও হক বা সত্যকে পরিবর্তন করতে চাও অথচ তুমি নিজেও জান না যে হক বা সত্য কোনটি।

আর যদি তুমি মুজতাহিদ হয়ে থাক, তবে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে তিনি জ্ঞানের ওপর ধ্বংস করেছেন। আর তিনি তাদের কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের ওপর আবরণ বা পর্দা ঢেকে দিয়েছেন। সুতরাং তার 'ইলম বা জ্ঞান কোনো উপকার করে না। আর সে যা শিখেছে তা তার বিরুদ্ধে দলীল। সে আলো থেকে অন্ধকারে ফিরে এসেছে, আর দৃঢ় বিশ্বাস থেকে সন্দেহের দিকে ফিরে এসেছে, সে সুরাইয়া তারকা থেকে মাটিতে নেমে এসেছে, তার এই দুইহাত ও মুখের জন্য। আর যদি ঐ মুক্বাল্লিদ দাবি করে যে তার ইমাম যা কিছু বলেছেন সবই হক্ব বা সত্য বলেছেন। যদি সে স্বীকৃতি দিত যে তার কথায় হক্ব বা সত্য ও মিথ্যা, দু'টিই আছে। নিশ্চয়ই সে মানুষ, সে সঠিক ও ভুল উভয়টিই করে। বিশেষ করে রায় বা ব্যক্তি মতামতের ক্ষেত্রে কেবল সে যেন জলন্ত আগুনের কিনারে আছে। আমরা তাকে বলব যদি তুমি একথা বল, তবে তুমি সঠিক কথা বলেছ। আর একথাটিই তোমার ইমামও বলেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি তার মাযহাব সম্পর্কে এবং তিনি যেসব মাসআলাসমূহ লিখিতভাবে একত্রিত করেছেন সেগুলো সম্পর্কে জানতে চাইত, তবে তিনি এরকমই বলতেন। কিন্তু তুমি আমাদেরকে বল যে, কোন বস্তু তোমাকে বাধ্য করল সত্য ও অসত্যের সম্ভাবনা রাখে এমন জিনিষের মালা তোমার গলায় পরার জন্য? তুমি সেটাকে আবশ্যক করে নিয়েছ আর দীন হিসেবে গ্রহণ করেছ তার কোন একটি অংশও বাদ দেওয়া ছাড়াই। তোমার ইমামের ভুলকে আল্লাহ ওযর বা অপারগতা

হিসাবে নিবেন। বরং তার বিনিময়ে তিনি তাকে সাওয়াব দিবেন। যেমনটা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কেননা তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ। আর মুজতাহিদ ভুল করলেও তাকে সাওয়াব দেওয়া হয়। যেমনটা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন। কিন্তু তোমাকে কে সংবাদ দিল যে তুমি ভুলের অনুসরণ করলেও তোমাকে ওযরগ্রস্ত বা অপারগ গণ্য করা হবে? এতে কোন দলীল তোমার পক্ষে কাজ করবে?

যদি তুমি বলো, যদি আমি তাক্বলীদ ছেড়ে দিয়ে 'আলিমদের কাছে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল জানতে চাই, তবুও অকাট্যভাবে সঠিক ব্যাপারটি জানা যাবে না, যেহেতু যাকে আমি জিজ্ঞাসা করব ও গ্রহণ করব সেখানেও সত্য ও ভুলের সম্ভাবনা থেকেই যাবে।

তাহলে জবাব হল: ছ্বহীহ দলীলকে আঁকড়ে ধরা সর্বদা সঠিকই হয়ে থাকে। আর এটা আবশ্যক যে, তুমি কুরআন ও সুন্নাতের 'আলিমের কাছে তোমার দীনের 'ইবাদত ও লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে। তুমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছ তা ব্যতীত অন্য কোনো ফাতাওয়া প্রদান করতে তারা আল্লাহকে অধিক ভয় করবে, যখন তুমি যে বিষয়ে আমল করতে চাচ্ছ সে বিষয়ে তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত সম্পর্কে জানাতে বলবে। বরং সকল মুসলিম জানে আল্লাহর কিতাব ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত সত্য। তা মিথ্যা বা ভুল নয়। আর এটাই এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা।

আর আমরা যদিও মেনে নেই যে, যাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সে ব্যক্তি গবেষণায় দুর্বল, তাহলে সে হয়ত দ্বঈফ হাদীছ দ্বারা ফাতাওয়া দিল আর ছ্বহীহ হাদীছ ছেড়ে দিল। অথবা সে মানসূখ বা রহিত আয়াত দিয়ে দলীল দিল আর মুহকাম বা যে আয়াত দ্বারা বিধান সাব্যস্ত হবে তা ছেড়ে দিল। তবুও এতে তোমার কোনো সমস্যা হবে না।

কারণ তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। আর পবিত্র শরী'আতের ক্ষেত্রে তুমি 'আলিম বা জ্ঞানীদের দারস্থ হয়েছ, কোনো ব্যক্তির রায় বা ব্যক্তি মতামতের নয়। আর কোনো মুক্বাল্লিদের কথা তোমার এই কথার মত হবে

না। কেননা সে মনে করে তার ইমাম মিথ্যা কথা বলা থেকে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে। এ ক্ষেত্রে আমরা বলব, তিনি নিজেই তো স্বীকার করেছেন তার কিছু ব্যক্তি মতামতে ভুল আছে। আর তিনি তার সেই ভুলের অনুসরণ করার জন্য তোমাকে নির্দেশ দেননি। বরং তিনি তোমাকে তার তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন বর্ণনা ইতোপূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে চার মাযহাবের ইমামগণসহ সকল মুসলিমদের থেকে। তবে যাকে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে এবং সে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারাই তোমাকে ফাতওয়া দেন সে এর বিপরীত; কেননা সে জানে যে, কুরআন ও সুন্নাহতে যা কিছু আছে তার সবই সত্য, সঠিক, হিদায়াত এবং নূর। আর তুমি তার কাছে এটা ছাড়া আর কিছুই চাওনি।

অতঃপর আমরা তোমাকে বলব, হে মুক্বাল্লিদ! তোমার কি ব্যাপার বল তো! শাখাগত সকল মাসআলায় তুমি বল তুমি তাতে মুক্বাল্লিদ। তাতে কোনটা সঠিক তা তুমি জান না। অতঃপর যখন আমরা তোমাকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছি আল্লাহর দীনের ক্ষেত্রে তুমি যে তাক্বলীদের ওপর আছ তা জায়িয নয়। তখন তুমি নিজের মতের ওপর অটল থাকছো। যা তোমার জন্য জায়িয নয়। আর তুমি এমন স্থানে অবস্থান করছ, যার যোগ্যতা তোমার নেই, এবং এমন এক মর্যাদায় নিজেকে অধিষ্ঠিত করছ যার হকদার তুমি নও।

আর তুমি তাক্বলীদকে জায়িয প্রমাণের জন্য ঝগড়া ও দলীল উপস্থাপন শুরু করেছ আবার প্রত্যাখ্যাত সন্দেহের অবতারণা করেছ যা আমরা ইতোমধ্যেই এই গ্রন্থে অপনোদন করেছি। তাহলে কেন তুমি নিজেকে এই মৌলিক, কঠিন ও বহু শাখাযুক্ত মাসআলাতে নিজেকে কাজে লাগাচ্ছ না যেমনটি তুমি প্রশাখাগত মাসআলাতে নিজেকে কাজে লাগাচ্ছ? সুতরাং তোমার কী হল যে, তুমি নিজেকে বিশিষ্ট ব্যক্তির স্থানে উন্নীত করছ এবং যারা শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী তাদের পথ ধরে হাটছ? [তোমার জানা থাকা উচিত] যে ব্যক্তি নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানে সে ধ্বংস হয় না।

সুতরাং তুমি এখানে বল: আমি জানি না, আমি মানুষকে বলতে শুনেছি আর তাই বলেছি।

আমরা বলিঃ আসলে তোমার এই জবাব অচিরেই কবরে দাফন হওয়ার পরে মুনকার-নাকীরের জন্যও হবে যখন তোমাকে বলা হবেঃ ‘তুমি কী জানতে না? তুমি কী পড়নি?” যেমনটি ছুহীহ নছ্ব দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

আর যখন তুমি স্বীকৃতি দেবে যে, তুমি জান না, তখন অজ্ঞতার চিকিৎসা তো জিজ্ঞাসা করা। সুতরাং তুমি জিজ্ঞাসা কর তাকে যার দীন, ইলম এবং তার তাক্বলীদের মাসআলাতে ইনসাফ রয়েছে, যাতে তুমি তা বুঝে-শুনে জানতে পার। যদি তোমার ইমাম জীবিত থাকতেন তবে আমরা তোমাকে তার কাছেই যেতে পরামর্শ দিতাম এবং তার উপরেই তোমাকে নির্ভর করতে বলতাম; কেননা তিনিই প্রথমে তোমাকে তাক্বলীদ করতে নিষেধ করতেন যেমনটি তোমাকে আমরা ইতোপূর্বেই জানিয়েছি। কিন্তু সে তো এখন জীর্ণতার কাছে বন্ধকে পরিণত হয়েছে আর মাটির স্তরসমূহের নিচে শুয়ে আছে।

সুতরাং বর্তমান আলিমদের মধ্য হতে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা কর। আর -আলহামদুলিল্লাহ- তারা ইসলামী ভূখণ্ডের প্রতিটি কোনায় কোনায় বর্তমান রয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তার দীনকে এদের মাধ্যমে হিফাযত করেছেন আর বান্দাদের উপরে তার দীনের হুজ্জাত (প্রমাণ) দাড় করিয়েছেন এসকল আলিমদেরকে টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে অথবা হতে পারে তা তোষামোদ, অথবা সম্মানপ্রাপ্তির জন্য অথবা সম্পদ লাভের আশায়। কিন্তু তারা যখন জানতে পারে কে হক্ব বা সত্যকে তালাশ করে ও এ ব্যাপারে আগ্রহী এবং তার দীনের ব্যাপারে ছাহাবীদের, তাবিঈদের ও তাবি-তাবিঈদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন তারা তার কাছে হক্ব বা সত্যকে গোপন করে না। আর তারা তার থেকে পথভ্রষ্টও হয় না। তুমি যদি কোনো আলিমকেই বিশ্বাস না কর, কেবল তোমার সেই ইমামকে বিশ্বাস করো যার মাযহাবে তুমি বেড়ে উঠেছ। তাহলে আমরা ইতিপূর্বে যে দলীল পেশ করেছি তার দিকে ফিরে যাও। এতে তোমার অনেক কল্যাণ হবে এবং অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

نصيحة بليغة لمن يتصدر للفتيا وَالْقَضَاء من المقلدين

যারা মুক্বাল্লিদদের মধ্য থেকে ফাতাওয়া ও বিচার করে তাদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ উপদেশ

তুমি জেনে রাখ। হে মুক্বাল্লিদ! আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। যদি তুমি তোমার মন থেকে ইনছাফের সাথে বিচার করো, আর তোমার বুদ্ধি , বিবেচনা শক্তি ও আমার সংকলিত এই গ্রন্থের সারমর্মের মাঝে উদার মনে চিন্তা করে দেখ, তবে তোমার এই কথা বুঝতে বাক্বী থাকবে না যে, তুমি ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন। তোমার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি, যেগুলোর সঙ্গে তোমার ইবাদাত ও লেনদেনের মত বিষয়গুলো জড়িত শুধুমাত্র এমন বিষয়ে তাক্বলীদ করছ তুমি, তাতেই যদি তোমার এই অবস্থা হয়, তাহলে তুমি তোমার এই অধপতনের শিকার হওয়া এই অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও যখন তুমি নিজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাকারীদের ফতওয়া প্রদান করা ও বিবাদমান পক্ষগুলোর মাঝে ফায়ছালা করার মহা দায়িত্বের আশা কর তাহলে জেনে রাখ যে তুমি পরীক্ষার্থী, তোমাকে দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে; তুমি বিপদগ্রস্ত, তোমাকে দিয়ে বিপদে ফেলা হচ্ছে। কেননা তোমার বিধান দিয়ে রক্তপাত ঘটানো হবে। আর যোগ্য ব্যক্তি থেকে ক্ষমতা ও অধিকার স্থানান্তরিত হবে। হারামকে হালাল করা হবে আর হালালকে হারাম করা হবে। আর তুমি আল্লাহর বিপক্ষে এমন কথা বলবে যা তিনি বলেননি তথা আল্লাহর কিতাব ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের দলীল ছাড়াই (তুমি কথা বলো)। বরং কোনো জিনিস সম্পর্কে তুমি জান না যে, তা কি সঠিক না ভুল। আর তুমি তো নিজেই স্বীকার করেছো যে তুমি তা জান না। তাহলে আল্লাহর সামনে তোমার উত্তর কি হবে?

কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দাদের মাঝে বিচারকারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে তাদের মাঝে ফায়ছালা করবে। আর তুমি জান না যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা উদ্দেশ্যে কি? আর তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন

ন্যায়বিচার করতে। আর তুমি তো জুলুম থেকে ন্যায়বিচার (কাকে বলে তা) জান না। আর তিনি তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ তুমি ন্যায়বিচার কি ও অত্যাচার কি তা জান না। কেননা ন্যায়বিচার হলো আল্লাহ যা শরী'আত সম্মত করেছেন তার অনুকূলে হওয়া। আর অত্যাচার হলো এর বিপরীত। আর এই আদেশগুলো তোমার জন্য নয়; বরং এগুলো অন্যের জন্য। সুতরাং তুমি কিভাবে সে জিনিস বাস্তবায়ন করবে যার আদেশ তোমাকে দেওয়া হয়নি? আর যার দায়িত্বভার তোমাকে দেওয়া হয়নি? আর আল্লাহ যা নাযিল করেননি তা দ্বারা তুমি বিচার করবে কিভাবে? অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾

আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম। [সূরা আল মায়িদাহ্ - আয়াত ৪৫] তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾

আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসেক। [সূরা আল মায়িদাহ্ - আয়াত ৪৭] তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾

আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির। [সূরা আল-মায়িদাহ্ - আয়াত ৪৪]

আর এ আয়াতে কারীমাগুলো প্রযোজ্য হবে যারাই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করেনি তাদের জন্য। আর তুমি তো দাবি করতে পার না যে, তুমি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার করতে পার। বরং তুমি স্বীকার করো যে, তুমি অমুক আলিমের কথা অনুযায়ী বিচার করেছ। আর তুমি জান না তিনি আল্লাহর বিচার দ্বারা বিচার করেছে কিনা। তিনি

কি কেবল তার রায় বা ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে বিচার করেছেন নাকি দলীল প্রমাণের আলোকে করেছেন? অতঃপর তুমি এও জান না যে তিনি কি দলীলের ক্ষেত্রে সঠিক করেছেন নাকি ভুল করেছেন? তিনি কি মজবুত দলীল গ্রহণ করেছেন নাকি দ্বঈফ দলীল গ্রহণ করেছেন? হে মিসকীন! তুমি তোমার নিজের প্রতি কি করেছ? তোমার এই মূর্খতা তুমি নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখনি; বরং তোমার এই মূর্খতা তুমি আল্লাহর বান্দাদের মাঝেও ছড়িয়ে দিয়েছ। ফলে তুমি রক্তপাত ঘটিয়েছো, আর অনেক হাদ্দ বা শাস্তি কায়েম করেছ।

আল্লাহ মূর্খতাকে ধ্বংস করে দিক, বিশেষত যখন মূর্খ ব্যক্তি তার মূর্খতাকে তার নিজের উপর ও সকল মুসলিমদের উপর বিধান হিসেবে চাপিয়ে দেয়; কারণ তাহক্বীকের দৃষ্টিতে সে ত্বাগুত, যদিও তা পাতলা পর্দার আবরণ দ্বারা ঢেকে রাখার ফলে পর্দার অন্তরালে থেকে যায়। তাহলে হে মুক্বাল্লিদ ক্বাযী , তুমি আমাদেরকে উত্তর দাও, তুমি এই তিন ধরনের ক্বাযীদের মধ্যে তুমি কোন ধরনের শামিল? যাদের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল – ছ্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম – বলেছেন; ক্বাযীগণ তিন প্রকারে বিভক্ত: দুই ধরনের বিচারক জাহান্নামী, আর এক ধরনের বিচারক জান্নাতী। জাহান্নামী দুই ধরনের বিচারক হল – সেই ক্বাযী, যে অন্যায়ের পক্ষে ফায়ছালা করে, আর সে ক্বাযী, যে ন্যায়ের পক্ষে ফায়ছালা করে ঠিকই, কিন্তু সে এটা জানে না যে, “তার ফায়ছালা ন্যায়ের পক্ষে”। আর জান্নাতবাসী ক্বাযী হল সেই ক্বাযী, যে ন্যায়ের পক্ষে ফায়ছালা করে এবং এটাও জানে যে, “তার ফায়ছালা ন্যায়সম্মত”।

সুতরাং আল্লাহর কসম! তুমি কি ন্যায়বিচার করেছ, আর আদৌ তুমি কি জান যে, এই ফায়ছালা ন্যায়সম্মত কিনা? যদি তুমি এর উত্তরে হ্যাঁ বল, তবে তুমি নিজে এবং সকল আলিম তোমার ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হওয়ার সাক্ষ্য দিবেন, কেননা, তুমি নিজেই স্বীকার করেছ যে, তুমি সত্য বা ন্যায় এর ব্যাপারে জ্ঞান রাখ না, এমনিভাবে মুজতাহিদ মুক্বাল্লিদ সর্বশ্রেণির মানুষ তোমার বিরুদ্ধে একই সিদ্ধান্তে (মিথ্যাবাদী) উপনীত হবে।

আর যদি তুমি বল যে, তুমি তোমার ইমাম যেভাবে বলেছেন সেভাবে ফায়ছালা করেছ, তুমি জান না তা কি সঠিক নাকি ভুল? যেমনটা পৃথিবীতে

সকল মুক্বাল্লিদের অবস্থা। তুমি এটা স্বীকার করাতে এমন দু'জনের একজন হয়েছো, হয়ত তুমি ন্যায়বিচার করেছ, আর তুমি জান না যে এটা ন্যায়বিচার। অথবা তুমি অন্যায়বিচার করেছ। তুমি যে বিচার করেছ তা দুটি বিষয়ের একটি থেকে মুক্ত নয়। হয়ত তা হক্ব বা সত্য হবে, নতুবা তা অসত্য হবে। আর এ দু'প্রকারের যেটাই হোক না কেন, দলীল অনুযায়ী তুমি জাহান্নামী বিচারক বলে গণ্য হবে। আমার মনে হয় না এই দুটি বিষয়ে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংশয়ে নিপতিত হবেঃ প্রথম বিষয়, নাবী ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম – ক্বাযীদেরকে তিনটি তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন এবং এর পাশাপাশি প্রত্যেকের এমন বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যা অনুধাবন করতে পরিপূর্ণ আলিম হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয়ত- মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি দাবি করে না যে, সে তার ইমামের কথার সত্যতা ও মিথ্যার ব্যাপারে জানে। বরং সে নিজেই স্বীকার করে যে, সে অন্যের কথা গ্রহণ করে, আর সে তার দলীল জানতে চায় না। আর সে এটাও স্বীকার করেছে যে, তার কাছে দলীল নিয়ে আসলে সে দলীল বোঝে না। সুতরাং বোঝা গেল যে, সে এমন কোনো বিচার করেছে যা সে জানেনি (বোঝেনি)। যদিও তা হক্ব বা সত্যের সাথে মিলে যেত তবুও সে তা ইলম ছাড়া ফায়ছালা করেছে।

আর যদি তা না মিলে তবে সে তো অন্যায়ভাবে ফায়ছালা করেছে। আর এ দু'প্রকারের বিচারকই জাহান্নামী। সুতরাং মুক্বাল্লিদ বিচারক এ দু'অবস্থায়ই জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। যেমনটা কবি বলেছেন,

"তোমরা হারশার সামনে অথবা পিছন দিয়ে অগ্রসর হও, কেননা হারশার উভয়প্রান্তই তোমাদেরকে উটের গন্তব্যে নিয়ে যাবে" যেমনটি আরবরা বলে,

لَيْسَ فِي الشَّرِّ خِيَار

"মন্দের ভিতরে কোন ভাল নেই"

অবশ্যই সে ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়েছে যে কোন অবস্থাতেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না। সুতরাং হে মুক্বাল্লিদ বিচারক! তোমাকে এই ধংসের মধ্যে কে ফেলল? আর তোমাকে কে এই পরিস্থিতিতে ঠেলে দিল যে, যাই কর না কেন তুমি জাহান্নামী হয়ে যাবে? যত সময় তুমি তোমার বিচার কাজ চালিয়ে যাবে, আর তাওবা করে ফিরে না আসবে; ততক্ষণ পাপী ও বিভিন্ন প্রকারের খারাপ লোকগুলো তোমার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি আশাবাদী, তারা তাকে বেশি ভয় করে, কারণ তারা তাদের অপরাধগুলোকে পেশ করে, আর কঠিনভাবে তাওবার সংকল্প করে, পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে, তাওবা করে ফিরে আসে। আর প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। তাওবা করে আর নিজেকে তিরস্কার করে, সে যে পাপ করেছে তার জন্য। আর সে পছন্দ করে যে, সে সকল পাপ থেকে নিজেকে পবিত্র করার পরে যদি তার মৃত্যু আসত! কোনো দু‘আকারী যদি তার জন্য দু’আ করে যে, হে আল্লাহ! মৃত্যু পর্যন্ত তুমি তাকে পাপ ও গুনাহের কাজে লিপ্ত রাখবে। তাহলে সে ও প্রত্যেক শ্রবণকারী এটা জানে যে, এ দু’আটি তার জন্য বদ দু’আ হলো। তার কল্যাণের জন্য হলো না।

যদি সে জানে যে, সে মৃত্যু পর্যন্ত তার পাপের ওপর থেকে যাবে, আর এ বাজে অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাহলে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। কেননা সে জানে তার এ অবশিষ্ট থাকা তার জন্য জাহান্নামকে আবশ্যক করে দিবে। সে এই মিসকীন বিচারকের বিপরীত। কেননা সে মাঝে মাঝে নির্জনে ও সলাতের পরে আল্লাহর কাছে দু’আ করে যেন ঐ (তাক্বলীদের বিদ‘আতী) নি‘আমত তার জন্য স্থায়ী হয়, আর সে তা দূর হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। আর তার থেকে আল্লাহ যেন সরিয়ে দেন চক্রান্তকারীর চক্রান্তকে, হিংসুকের হিংসাকে, এমনকি কেউ যেন তাকে সরাতে সক্ষম না হয়। আর তাকে যেন কেউ আলাদা না করতে পারে। সে সবসময় টিকে থাকার জন্য অনেক সম্পদ ব্যয় করে। সে সূদ-ঘুষও প্রদান করে তাদেরকে, যারা তাদেরকে টিকিয়ে রাখতে ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে সে দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আর তা অর্জনের জন্য নিজের জীবনকে সে উৎসর্গ করে, ফলশ্রুতিতে সে তা দ্বারা জাহান্নামকে ক্রয় করে নেয়। এই প্রবঞ্চিত ব্যক্তির সুপ্ত বাসনা,

উচ্চ আকাঙ্খা ও দূরবর্তী গন্তব্য হচ্ছে- সাধারণ মানুষের তার কাছে জড়ো হওয়া ও বাদানুবাদে জড়িত হওয়া। সে যদি সে বিবেকবান হত, তাহলে সে জানতে পারত যে, আসলেই সে কোন বড় নেতৃত্বের অধিকারী, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বা সম্মানিত ব্যক্তি নয়। আর একাজে তার সঙ্গী হয় সাধারণ জনতার একত্রিত হওয়া, দীর্ঘ সারিতে দাঁড়ানো এবং ভীড় জমানো এমন সব ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে অপমান করা হয়ে থাকে হয়ত হাদ্দ (দণ্ড-সাজা) কায়েম করে অথবা ক্বিছাছ (বদলা-প্রতিশোধ) বা তা'যীর (সাধারণ শাস্তি) এর মাধ্যমে।

এই সমস্ত লোকের একেকজনের কাছে এত পরিমাণ লোকের সমাগম হয় যে, প্রকৃত বিচারকের কাছে এর দশভাগের একভাগ লোকও একত্রিত হয় না। বরং কয়েকগুণে একত্রিত হয় খেল-তামাশায়, অশ্লীলতায়, ঠাট্টা-মশকরায়, গানের অনুষ্ঠানে, নাচের ও ঢোলের বাদ্য-বাজনার অনুষ্ঠানে, প্রকৃত বিচারকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার তুলনায়। এই মুক্বাল্লিদ অহংকারী হয়ে থাকে তার বাহনের জন্য এবং তার পাশে থাকা দুয়েকজন খাদিমের উপস্থিত থাকার জন্য। সুতরাং তার জানা থাকা উচিত যে, দাস ব্যক্তি, মূর্খ সেনা-সদস্য এবং ইয়াহূদী-নাসারাদের সন্তানরা তার থেকেও উৎকৃষ্ট বাহনে আরোহণ করে। তার সাথে চলা খাদিমের থেকে তাদের কাছে বিদ্যমান খাদিমের সংখ্যাও বেশী। সুতরাং যখন তার এই কাজে নিপতিত হওয়াটা সর্বাবস্থায় জাহান্নামে যাওয়ার কারণ এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবিকা ও অঢেল সম্পদ আহরণ করা, যা তাকে ঘুষ পর্যন্ত দিতে প্ররোচিত করে। সুতরাং এই ব্যক্তির জানা উচিত যে, নিশ্চয়ই সাধারণ দীনি পেশাজীবী মানুষ যেমন- তাঁতী, যে শিঙা লাগায়, কসাই ও যে জুতার কাজ করে, এরা সকলে তার চেয়ে শান্তির নি'আমত বেশী পেয়েছে। তার চেয়ে তাদের হৃদয়ে অধিক প্রশান্তি আছে। কেননা তারা অপসারণের তিক্ততা (চিন্তা) থেকে মুক্ত, তারা অবস্থার পরিবর্তনের কোনো গুরুত্ব দেয় না। তারা তাদের দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করে, তাদের নিজেদেরকেও উপভোগ করে, আর দুনিয়ায় জীবন অনুযায়ী তারা তাদের এই নি'আমতে পরিবর্তন আনে।

আর আখিরাতের জীবন অনুযায়ী তারা ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে, কেননা তারা কোনো কারণে শাস্তিকে ভয় পায় না, যে শাস্তি আসে জীবিকার দিক

থেকে বা জীবনের শৃঙ্খলার দিক থেকে। কেননা তাদের জীবিকা হালাল, তাদের হাত যুলম থেকে মুক্ত। সুতরাং তারা জান-মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়া থেকে ভয় পায় না। বরং তাদের হৃদয় আশা দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে। আর তাদের প্রত্যেকেই আশা রাখে তারা কষ্টের জীবন থেকে বেরিয়ে এসে শান্তি ও নি'আমতের জীবনে পদার্পণ করতে।

আর এই মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি তো অতৃপ্ত জীবন, স্বল্প নি'আমত ও তার (উদ্বেগ মিশ্রিত) জীবনের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাওয়া একজন হতভাগ্য। যখনই তার কাছে কোন বিচার বা মামলা-মোকদ্দমা আসে, বিরোধিদের বিরোধিতা আসে এবং এমন ব্যক্তিকে আটক করার কথা প্রসঙ্গ আসে যে তার ফায়ছালা গ্রহণ, সমাধান গ্রহণ ও চিন্তা, উদ্বেগ, ক্লেশ, অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের সাথে কৃত কার্য সম্পাদনকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এবং সেই সাথে এই আসামী এমন হয় যে, সে অবস্থার পরিবর্তন চায়, তাকে প্রভাবিত করতে চায়, তার সূর্য অস্তমিত করতে চেষ্টা করে, তার শক্তিকে অচল করে দিতে চায়, তার বিপদের সময়ে সৌভাগ্যকে দূরীভূত করতে চায়, তাকে বিপদে দেখে আনন্দ পায় ও তার বন্ধুদের মাধ্যমে অন্যায় কাজ করাতে চায়, তখন তার আর শান্তি থাকে না আর সে নি'আমতকেও ভোগ করতে পারে না। বরং জীবন জুড়ে সে এক চরম উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যেতেই থাকে। যেমনটি কবি মুতানাব্বী বলেছেন:

আনন্দের সময়ে আমার কঠিন উদ্বেগ এটা নিয়ে, অচিরেই তা এর
অধিকারীর কাছ থেকে চলে যাবে

বিশেষ করে যখন ঐ মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি তার সমপর্যায়ের বিরোধী কারো কাছ থেকে হিংসার শিকার হয়; কেননা ঐ ব্যক্তি যাই শুনুক না কেন তা কেবল তার বিরক্তিরই কারণ হয়। কখনো কখনো তাকে বলা হয়, মানুষেরা আলোচনা করছে যে: আপনি ভুল করেছেন এবং মুর্খতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার কখনো কখনো বলা হয়: অমুক ক্বাযী আপনার বিরোধিতা করেছেন অথবা অমুক মুফতি আপনার বিরোধিতা করেছেন তাই আপনার হুকুমকে নাকচ করা হয়েছে, আপনার জ্ঞানও লোপ পেয়েছে, আপনার মর্যাদাকে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং আপনার পদমর্যাদার অবনতি ঘটেছে। আবার কখনো হুকুমপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার সামনে

আসে আর প্রকাশ্যে বলতে থাকে: “আমি তোমার হুকুম অনুযায়ী চলি না” বা অনুরূপ অন্য আরো কঠিন কথা।

অতঃপর সে যদি তার হুকুমের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং বিরোধিতা প্রতিহত করে তবুও সেটা জাহিলী অবস্থান ও ত্বাগূতী শয়তানী প্রতিরোধ হিসাবে বিবেচিত হবে। আর তখন এ কাজ হতে পারে পদ মর্যাদা, সম্মান, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি চলে যাওয়া থেকে অন্যায়ভাবে ধরে রাখার চেষ্টা হিসাবে। এসত্ত্বেও সে সে জানে না হক্ব বা সত্য কি তার হাতে? অথবা যে তার আদেশকে অস্বীকার করেছে তার হাতে? কেননা মুক্বাল্লিদ মিসকীন তো তার স্বীকৃতি অনুযায়ীই সত্য জানে না। আর তার কাছে যারা দ্বন্দ্ব নিয়ে এসে সমাধান নিয়ে গেছে, যাদের বিচার সে করেছে, তারাই তো নিন্দা ও দাবি করেছে যে, সে অন্যায়ভাবে হুকুম দিয়েছে। এবং তার বিবাদী হতে উৎকোচ গ্রহণ করেছে অথবা বিবাদী তাকে তোষামোদী করেছে। আর এটা স্থির হয়ে থাকে ঐ মুক্বাল্লিদের সমগোত্রীয় শত্রুতা পোষনকারী ব্যক্তিদের প্ররোচনা থেকে, যারা তার ঐ পদে নিজেকে বসাতে চায় অথবা তার দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানে অভিষিক্ত হতে চায়।

সুতরাং সে তাদের কাছে যেয়ে ফাতওয়া জানতে চায় এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, এর প্রেক্ষিতে ক্বাযীর ব্যাপারে তারা বিভিন্ন অপরিচিত মতসমূহ তালাশ করে, বিরল মতপার্থক্যগুলোর আশ্রয় নেয় এবং তারা তাদের কাছে লিখিত পত্র লিখে নেয় উক্ত ক্বাযীর হুকুমের বিরোধিতা করার জন্য। কখনো কখনো তাদের লিখিত পত্রের মধ্যে এমন ভাষা থাকে যা ক্বাযীকে কষ্ট দেয় ও ব্যথিত করে। সুতরাং একারণেও তার মধ্যে ব্যাথা কাজ করে আর তার চিন্তা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এটা তার সমগোত্রীয় মুক্বাল্লিদরাই করে থাকে।

তবে মুজতাহিদ আলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, ঐ ব্যক্তি যে সকল সিদ্ধান্তই দিক না কেন তা মিথ্যা। কেননা সে জাহান্নামী বিচারক। তার থেকে যে বিচার আসে তারা সেটাকে তারা মূল হিসাবে গণ্য করেন না। আর তারা তাকে বিচারক হিসাবেও বিশ্বাস করেন না। কারণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল আছে যে, মুজতাহিদ ছাড়া কেউ বিচারক হবেন না। আর মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি যদিও পরহেযগারিতা, সৎচরিত্র ও আল্লাহ ভীতিতে অলীদের পর্যায়ে

পৌঁছে যাক না কেন, সে তাদের নিকট তার নিজেকে বিচারের কাজে নিয়োজিত রাখার কারণে পাপের ওপর জিদকারী (নাছোড় বান্দা) হিসাবে গণ্য হবে।

আর তার থেকে যা কিছু আসে তারা সেগুলোকে সাধারণ মানুষ যারা বিচারক ও মুফতী নন তাদের থেকে যা আসে সেরকম মনে করেন। সুতরাং যেসব ভলিউমের (বইয়ের) ওপর তাদের নাম লেখা আছে, তাতে মিথ্যাভাবে যা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা হয়েছে তারা তাকে কিছুই গণ্য করেন না। বরং যদি তা সত্যের সাথে মিলেও যায় তবুও তা তাদের নিকট তা গণনার বাইরে থাকে। কেননা তা এমন বিচারকের কাছ থেকে প্রকাশ পেয়েছে, যে সত্য বিচার করেছে না জেনেই। সুতরাং পরকালে সে জাহান্নামের অধিবাসী। আর সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা দুনিয়াতে বিচারক হওয়ার যোগ্য নয়। আর কোনো ক্ষেত্রে তাকে মুজতাহিদ বিচারকদের মর্যাদা দেওয়া বৈধ নয়।

এসব কিছুর পরও এ ক্ষতিকর বিচারক সুলতানের তোষামোদ করতে চায়, আর তাদেরও তোষামোদ করতে চায় যারা সুলতানের কাছে সহযোগী হিসেবে গ্রহণযোগ্য তাদের দরবারে গিয়ে নিজেকে তাদের কাছে লাঞ্ছিত করে, তাদের কাছে বিনয়ী সাজে, তাদের দরবারে বারবার যাতায়াত করে, তাদের তিরস্কারকে সহ্য করে, আর ঐ মুক্বাল্লিদ এটা সব সময় না করলে তারা তাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে থাকে যাতে তার সমস্যা আরো জটিল হয়ে পড়ে। আর তার চারপাশে সুবিধা পাওয়ার জন্য ঘুরে বেড়ানো সহযোগী ও অবৈধভাবে সম্পদ গ্রহণকারীরাও তার হাতেই থাকে।

আর যদিও তারা তাকে সম্মান করে এবং মর্যাদাও দেয় আর তার কথায়ই ওঠে-বসে তবুও তা তার জন্য তার শত্রুদের থেকেও বেশী ক্ষতিকর; কেননা তারা মানুষের সম্পদের উপরে পাগলের মত ঝাপিয়ে পড়ে আর তা বাস্তবায়িত হয় তার হাতে থাকা ক্ষমতার মাধ্যমে।

বিশেষ করে যদি সুলতান (বাদশা) অসচেতন হয়, আর তার কাজগুলো পর্যবেক্ষণ না করে, তবে বিচারকের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অনেক বড় হয়ে যায়। আর তার দিকেই সম্পর্কিত করা হয় তাদের কার্যক্রমকে আবার তাদের অন্যায়গুলোও তার ঘাড়ে চাপানো হয়, কখনো কখনো তাকে

পর্যবেক্ষনের ত্রুটিতে অভিযুক্ত করা হয়, আবার কখনো কখনো তাকে অসচেতনতা ও গাফেল হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, আবার কখনো তাকে তার সহযোগীরা যে সব সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহন করেছে তাতে তার লাভ আছে বলে অভিযুক্ত করা হয়, আর যতি তা না হত, তবে সে তাদের লাগাম ছেড়ে দিত না এবং মানুষের মাঝে ও তাদের মাঝে কোন পথ থাকত না।

আর এর চেয়ে বড় ব্যাপার হলো তার এসব সহযোগী তাকে নিন্দা করে ও তার মান-সম্মান নষ্ট করাকে বৈধ মনে করে। কেননা তাদের প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব লাভ চায়। সুতরাং যখন কোন পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বণ্টন ও বিবাদমান কোন জমির মোকদ্দমা তার সামনে পেশ করা হয়, আর সেখানে তাদের কোন লাভ থাকে, তখন এই মিসকীন ক্বাযীর তাদের কাউকে সেটা দিতে বাধ্য হয়ে পড়ে। তখন তারা সকলেই তার প্রতি রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে যায় এমতাবস্থায় যে, তাদের অন্তর ক্ষোভে জ্বলতে থাকে। তারা মাহফিলে তার নিন্দা করতে থাকে, বিশেষ করে তার শত্রুদের ও তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঝে। এবং তারা তার কাছে আসা বিবাদগুলোর ব্যাপারে তাদের উপস্থিতিতে তার সিদ্ধান্তের প্রতি ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এবং তারা তার কথাকে বিকৃত করে কখনো এটাকে ভুল বলে চালিয়ে দেয়, আবার কখনো অজ্ঞতা বলে তার দিকে সম্পর্কিত করে। কখনো বলে থাকে অর্থলিপ্সু আবার কখনো চাটুকার বলে অভিহিত করে।

মোটকথা সে সকলকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয় না। বরং সর্বাস্থায় তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে যায় তাকে তিরস্কার করা। ফলে সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর সে তাদের থেকে পায় কষ্ট ও যন্ত্রণা। আর তারা তার ভালোবাসার ও কাছের লোক। তারা তার আদেশ ও নিষেধ দ্বারা উপকৃত হয়েছে। আর তারা তার ফায়ছালা দ্বারা উপকৃত হয়েছে। কতইনা সঠিক কথা যা পূর্ববর্তী কোন একজন ক্বাযী বলেছেন, তিনি এদেরকে বর্শার ফলা হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর এসব থেকে খুবই সামান্য মানুষ বের হতে পারে। আবার কখনো এমন অবস্থাও আসতে পারে যে, কেউ হয়ত এই দোষে দোষী নয়। এটাই হল মুক্বাল্লিদ ক্বাযীর দুনিয়াবী অবস্থা। আর তার পরকালের অবস্থা সম্পর্কেও তুমি জেনেছ, তা হলো- সে দু'জন

জাহান্নামী বিচারকের একজন। কোনো অবস্থায় সে তা থেকে বের হতে পারবে না। যে বিষয়ে পর্যালোচনা পূর্বে গত হয়েছে।

আমাদের পূর্ববর্ণনা অনুযায়ী সে দুনিয়াতে অশান্তি ও অস্থিরতায় আবদ্ধ থাকার পাশাপাশি আখিরাতের পরিণতির ব্যাপারেও সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকে বান্দাদের ব্যাপারে — ক্বুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত দলীলই নয়, বরং শুধুমাত্র তাক্বলীদ আর মুর্খতার বশবর্তী হয়ে বিচক্ষণতা পরিহার করে — তার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর কারণে। সে তার গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, মামলা খারিজ করার ক্ষেত্রে এবং বিচার বিভাগ পরিচালনার ক্ষেত্রে, এমনকি দলীল উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও সে এমনটাই করে থাকে, অথচ ক্বুরআনে স্পষ্টভাষায় না-জানা বিষয়ের উপর আমল করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ﴾

আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না। [সূরা বানী ইসরাঈল- আয়াত ৩৬]

এই অর্থে ও ধারণার অনুসরণ করা থেকে নিষেধের ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত বিদ্যমান।

আর মুক্বাল্লিদের তো কোন জ্ঞানই নেই। আর তার ধারণাও সঠিক নয়। এ ব্যাপারে ধমক স্বরূপ কুরআনের আয়াতগুলো আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾

আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের। [সূরা আল-মায়িদাহ্ - আয়াত ৪৪]। তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾

আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসেক। [সূরা আল-মায়িদাহ্ - আয়াত ৪৭]। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾

আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম। [সূরা আল-মায়িদাহ্ - আয়াত ৪৫]

আর অন্যান্য আয়াতে আছে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী সত্য ও ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আরো প্রমাণিত আছে যে, যে ব্যক্তি অন্যায়বিচার করল অথবা ন্যায়বিচার করল কিন্তু না জেনে যে এটা সত্য; তাহলে সে জাহান্নামী বিচারক।

যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর মুক্বাল্লিদের জন্য যখন চূড়ান্ত বিচার করা ঠিক নয়। আর এটার দায়িত্ব পালন করা তার অথবা অন্য কারো যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার জন্যেও বৈধ নয়। তাহলে তুমি মুক্বাল্লিদ মুফতির ব্যাপারে কি বলবে?

আমি বলব: যদি তুমি তাকে অযথা কথাবার্তা ও ব্যক্তিদের মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর,

তাহলে কথা হচ্ছে মুফতি হওয়ার শর্তসমূহ উসূল ও ফিক্বহের কিতাবে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। আর যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর সে সম্পর্কে যা আমি বিশ্বাস করি ও মতপ্রদান করি জবাব হিসেবে, তাহলে বলব: আমার মতে মুক্বাল্লিদ মুফতির জন্য জায়েজ নয় যে, সে এমন কাউকে ফাতওয়া দিবে যে তার কাছে আল্লাহ ও তার রসূলের হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে অথবা সত্য সম্পর্কে অথবা শরী'আতে প্রতিষ্ঠিত কোন কিছুর ব্যাপারে অথবা তার জন্য হালাল অথবা হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। কেননা মুক্বাল্লিদ এসব

বিষয়ের কোন কিছুই তাহক্বীক সহকারে জানে না। বরং মুজতাহিদ ছাড়া কেউই এসব বিষয়গুলো জানে না।

অনুরূপভাবে যদি কোনো প্রশ্নকারী পূর্বের বিষয়সমূহের কোনোটিকে শর্ত করা ছাড়াই সাধারণ ভাবে তাকে প্রশ্ন করে, তবুও মুক্বাল্লিদের জন্য ঐ বিষয়ের কোনোটিতে ফাতাওয়া দেওয়া বৈধ নয়। কেননা সাধারণ প্রশ্নটি পবিত্র শরী'আতের দিকে ফিরে, কোনো বক্তার কথার দিকে নয়, অথবা কোনো রায় বা ব্যক্তিগত মতামত পোষণকারীর মতের দিকেও নয়।

আর যখন কোনো প্রশ্নকারী তাকে কোনো ব্যক্তির কথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে অথবা কোনো ব্যক্তির রায় বা ব্যক্তিগত মতামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, অথবা অমুক ব্যক্তি যা উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে মুক্বাল্লিদ ব্যক্তির তা উল্লেখ করাতে কোনো সমস্যা নাই। তাকে তা বর্ণনা করবে যদি সে সেই আলিমের মাযহাব সম্পর্কে জানে, যেমন- তার (মাযহাবী আলিমের) কথা, তার মতামত অথবা তার মাযহাব সম্পর্কে যা তাঁকে প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছিল। কেননা সে এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়েছে, যার উত্তর দিতে সে সক্ষম। এটা আল্লাহ যা বলেননি তা বলে তার কথার ওপর কথা বলা নয়। আর কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা পরিচয় করিয়ে দেওয়ারও কোনো বিষয় নয়। আর এ ব্যাখ্যাটি সঠিক যা কোনো ইনসাফকারী ব্যক্তি অপছন্দ করেননি।

সুতরাং যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাযহাব ও তার ব্যাপারে কথা বলার জন্য মুজতাহিদের কাছে প্রশ্ন করে তাহলে প্রশ্নের আলোকে ফাতাওয়া দেওয়া তার (মুজতাহিদের) জন্য জায়িয আছে কি? (উত্তরে) আমি বলছি, তা শর্ত সাপেক্ষে জায়িয। তা হলো, ঐ রায় বা ব্যক্তিগত মতামত অথবা মাযহাব যদি সঠিক না হয় তবে তা উল্লেখ করার পরে এমন কিছু কথা বলবে যাতে করে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় সত্য এর বিপরীত। কেননা আল্লাহ আলিমদেরকে সাধারণ মানুষের জন্য বর্ণনা করার (ওয়াজ করার) জন্য ধরবেন। আর এটা তারই অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে যখন সে জানে প্রশ্নকারী ঐ রায় বা ব্যক্তিগত মতামত অথবা বিরোধী মাযহাবকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে। তার

বিরোধিতায় চুপ থাকা প্রশ্নকারীকে ধোঁকায় ফেলবে যে সে হক্ব বা সত্যের ওপর আছে। আর এতে বিরাট ক্ষতি আছে।

যদি সে ব্যক্তি মাযহাবের ভুল বলতে গেলে নিজের ওপর যুলুমের ভয় করে, তবে সে উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাবে। আর অন্যের কাছে প্রশ্নকারীকে (উত্তর জানার জন্য) পাঠিয়ে দিবে। কারণ তাকে এমন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়নি যার জবাব দেওয়া তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যদি একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে আর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব না হয়ে থাকে, তবে উচিত হলো তাকে এমন সুস্পষ্ট ভাবে বোঝানো যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে। এভাবে বোঝাবে যে, এটা অমুকের মাযহাব অথবা অমুকের ব্যক্তিগত মতামত যে সম্পর্কে তাকে প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছিল আর সে এটি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করেনি।

আলহামদুলিল্লাহ, সমাপ্ত।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা

-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৩. উসূলুস সুন্নাহ

-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. শারহুস সুন্নাহ

-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৫. লুম‘আতুল ই‘তিক্বদ

-ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৬. কিতাবুল ঈমান

- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৭. কিতাবুত তাওহীদ

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৮. আক্বীদাতুত তাওহীদ

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৯. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১০. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১১. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১২. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৩. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৪. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৫. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৬. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৭. নাবী-রসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৮. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

১৯. খিলাফাত ও বায়'আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২০. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২১. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২২. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৩. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৪. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৫. এক নজরে ছ্বলাত

-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৬. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৭. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৮. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৯. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩০. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩১. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বইসমূহ

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৫. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৬. কিতাবুত তাওহীদ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৭. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৮. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

১০. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১১. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১২. আস-সিয়াসাহ্ আশ-শার‘ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

-সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]